বর্ষ বিদায় বর্ষবরণ

পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে সময় চলে যাচ্ছে এবং এভাবেই দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। এক সময় সময়ের গতি থেমে যাবে, আর তখনি এ দুনিয়া নি:শেষ হয়ে যাবে এবং কিয়ামাত সংঘটিত হবে। সুতরাং কালের আবর্তন, বছরের শুরু ও শেষ হওয়া অর্থহীন অথবা নিছক খেল তামাশা নয়। বরং মানব জীবনের জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেকের জীবনকাল বা সময়কাল নির্দিষ্ট। এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাকে তার উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। আবার মৃত্যুর পর তাকে তার দায়িত্ব পালনের সফলতা বা ব্যর্থতার জবাবদিহি করতে হবে এবং সে আলোকে ভালো বা মন্দ প্রতিদানও ভোগ করতে হবে। সুতরাং সময়, দিন, মাস, বছর প্রভৃতি কেন আসে, কেন যায় এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

স্থান ও কাল আমাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। কারণ এগুলোকে আশ্রয় করেই আমরা জীবন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি। আমাদের জীবনের মূল পুঁজি হলো সময়। পৃথিবী নামক স্থানে প্রতিটি প্রাণি জন্মের মুহূর্ত থেকে প্রতিনিয়ত সময়ের স্রোতে ভেসে প্রলয় সমুদ্রের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। যে পরিমাণ চলছে, সে পরিমাণ জীবনের পুঁজি নি:শেষ হচ্ছে। এভাবেই প্রতিটি জীব সসীম জীবনকাল থেকে অসীম ও অনন্ত জীবনে পাড়ি দিচ্ছে। আদিকাল থেকে এভাবেই চলে আসছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।

মাঝখানের সময়টুকুই দুনিয়ার জীবন। এ জীবনে যার আমল আল্লাহ ও রাসূল (সা.) নির্দেশিত পথে হবে, তার পরকালীন জীবন সুখময় হবে। পক্ষান্তরে এ জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল (সা) নির্দেশিত পথে চলবে না, সে ব্যক্তির পরকালীন জীবন হবে দুঃখময়। এজন্যই হাদীছে দুনিয়াকে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আল আসর)

আমরা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে উপনীত হয়েছি। এ মাস শেষ হলে আমাদের জীবন থেকে একটি বছর শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে ২০২৫ সাল, আরেকটি বছর শেষ হওয়ার সূচনাকাল। বর্ষ বিদায় এবং বর্ষ বরণের জন্য প্রতি বছর ঘটা করে 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' উদযাপন করা হয়। আলোক সজ্জা, পটকাবাজী, নারী পুরুষ মিলে হৈ হুল্লোর, নাচ, গান ইত্যাদিতে মত্ত থেকে সারা রাত কাটিয়ে দেয়া হয়। এগুলো করতে গিয়ে দুর্ঘটনা এবং নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে। উপরে সূরা তাওবার যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারো... সুতরাং তোমরা সেগুলোতে নিজের প্রতি জুলুম করো না অর্থাৎ পাপাচার করো না। এগুলো মূলত: পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। ইসলামের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। তাই মুসলিমদের এগুলো থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইসলামে জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী, বর্ষ বিদায় বা বর্ষ বরণের অনুষ্ঠান পালনের কোনো দিক নির্দেশনা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন, তাবে তাবে'ঈন বা কোনো ইমাম এগুলো পালন করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আরবী বা হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররাম এবং শেষ মাস জিলহাজ্জ। হাদীছে এ দু'মাসে কিছু 'আমলের কথা বলা হয়েছে। মুহাররাম মাসের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়। এদিন এবং এর আগের বা পরের একদিন যোগ করে রোযা পালন করতে বলা হয়েছে। এ রোযা পালন করলে এক বছরের গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে হিজরীর শেষ মাস জিলহাজ্জের নয় তারিখ, আরাফার দিন। হাদীছে বলা হয়েছে, আরাফার দিনে কোনো ব্যক্তি রোযা পালন করলে তার এক বছরের পূর্বের ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

মুসলিমগণ বর্ষ বরণ করবে 'ইবাদাতের (রোযার) মাধ্যমে এবং বর্ষ বিদায়ও দেবে 'ইবাদাতের (রোযার) মাধ্যমে। বর্ষ শুরুতে তারা গুনাহ না করার সংকল্প করবে এবং বর্ষ শেষ করবে 'ইবাদাত ও রোনাজারির মাধ্যমে বিগত বছরের গুনাহসমূহ মাফ চাওয়ার মধ্য দিয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বার্ষিকী, বর্ষবরণ প্রভৃতি ইসলামের সংস্কৃতি নয়। তাই সেগুলো থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। ■

দারসুল কুরআন

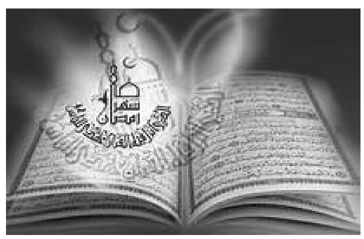

তাওহীদে বিশ্বাসী জাতি এক দুর্জয় জাতি

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ}

অনুবাদঃ 'আপনি কি দেখেন না আল্লাহ কিভাবে উপমা দেন? 'পবিত্র বাক্যের' উদাহরণ উত্তম গাছ, যার শিঁকড় সুদৃঢ় ও যার শাখা–প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। তার রবের অনুমতিক্রমে যা সর্বদাই তার ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উদাহরণসমূহ পেশ করে থাকেন; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর অপবিত্র বাক্যের তুলনা এক মন্দ গাছ, যা ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্নকৃত, যার কোন স্থায়িত্ব নেই' [ইবরাহীম– ১৪: ২৪– ২৬]।

নামকরণ: সূরাটির ৩৫ নং {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} 'আর স্মরণ করুণ, যখন ইবরাহীম বলেন, হে রব! এই শহরকে আপনি নিরাপদ করুন' আয়াতে উল্লেখিত 'ইবরাহীম' শব্দটিকেই নাম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এ সূরাটিতে ইবরাহীম ('আ) এর কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

নাযিলের প্রেক্ষাপট: সূরাটি হিজরাতের পূর্বে মাক্কায় নাযিল হওয়া একটি সূরা, [তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৪৭৬]। তবে ইবন 'আব্বাস ও কাতাদাহর মতে ২৮ ও ২৯ নং আয়াত দু'টি, কারো মতে ৩০ নং আয়াত তিনটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/২৯, তাফসীরুল কুরতুবী ৯/৩৩৮]।

মূল বিষয়বস্তু: মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ সূরাতেও মৌলিকভাবে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও শিরক ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাওহীদের পবিত্র বাণী; লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মহাত্ম, মৌলিকত্ব, দৃঢ়তা, স্থায়ীত্ব, ব্যাপকতা ও এর সর্বব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন উপকারিতার কথা বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে কুফর, শিরক ও তাগুতী ব্যবস্থার অসারতা, ভঙ্গুরতা ও এর ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ 'আপনি কি দেখেন না আল্লাহ কিভাবে উপমা দেন? 'পবিত্র বাক্যের' উদাহরণ উত্তম গাছ, যার শিঁকড় সুদৃঢ় ও যার শাখা–প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত'। মহান আল্লাহ কয়েক আয়াত পূর্বে কাফিরদের 'আমল ও কাজকর্মকে যখন ছাইয়ের সাথে তুলনা করেছেন, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের উপার্জিত কোন কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না। আয়াতটি হলো,

{مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}

'যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমা হল, তাদের কাজগুলো ছাইয়ের মত, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়', [ইবরাহীম– ১৪: ১৮]। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর মু'মিনগণের কথাবার্তা ও কাজকর্মকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে বলেছেন যে, তাদের কালিমায়ে তাইয়্যেবার উদাহরণ একটি উৎকৃষ্ট গাছের মত, যার শিঁকড় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এর শাখাগুলো দিগ–দিগন্তে বিস্তৃত, [তাফসীরুল কুরতুবী ৯/৩৫৯, ফাতহুল কাদীর ৩/১২৭]। আয়াতে كَلِمَةً طَيِّبَةً বলা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ 'পবিত্র কথা'। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, 'লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমা, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/৩৭]। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, 'কালিমা তাইয়্যেবা' হলো: লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহ; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, [তাফসীরুল কুরতুবী ৯/৩৫৯, তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৪৯১, ফাতহুল কাদীর ৩/১২৯]। অন্য কথায় এটি হচ্ছে তাওহীদের স্বীকৃতি, নাবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের স্বীকৃতি এবং

আখিরাতের স্বীকৃতি, আর কুরআন কারীম এ বিষয়গুলোকেই মৌলিক সত্য হিসেবে পেশ করে, [তাফহীমুল কুরআন ৬/১৮৭]। আর كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ বা উৎকৃষ্ট গাছ হলোঃ মু'মিনগণ, [তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৪৯১]। তারপর أَصْلُهَا ثَابِتٌ এর অর্থ হলো, 'লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহ', যা মু'মিনগণের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। এরপর وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ এর অর্থ হচ্ছে, এ কালিমা তাইয়েবা বা তাওহীদের এ পবিত্র বাণীর প্রতি সাক্ষ্য ও এর ঘোষণা দেয়ার কারণে এর মাধ্যমে মু'মিগণের সকল ভাল কাজ আসমানে উত্থিত হয়, [তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৪৯১]। অনেক মুফাসসির এমনটিই বলেছেন যে, উত্তম বৃক্ষ হল মু'মিনগণ, যাদের তুলনা বিভিন্ন হাদীসে খেজুর গাছের সাথে করা হয়েছে। কারণ খেজুর গাছ এমন একটি গাছ, যা ভাল কিছু উপহার দেয়। আবার মু'মিনগণ, যাদের ভাল কাজ সবসময় তাদের থেকে আসমানে উঠতে থাকে। মু'মিন ব্যক্তিগণ দুনিয়াতে ভাল কাজ ও ভাল কথা বলে যেতেই থাকে আর তার ফলাফল নির্ধারিত হয় আসমানে, [তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৪৯১]।

এ আয়াতে মু'মিনগণ ও তাদের কার্যক্রমের উদাহরণ এমন একটি গাছের সাথে করা হয়েছে, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং যার কাণ্ড সুদৃঢ় ও সুউচ্চ। গভীর শিকড়ের কারণে গাছটি এত শক্ত যে, প্রচন্ড দমকা হাওয়া ও ঝড়– তুফানে উপড়ে পড়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল দুষণ ও ময়লা–আবর্জনা থেকে মুক্ত। আবার এ গাছটির দিগন্ত জোড়া শাখা–প্রশাখা উচ্চতায় আকাশের দিকে ধাবমান। তাছাড়াও এ গাছটি সবসময় ফল দেয় এবং এর ফল সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ গাছ দ্বারা মু'মিনগণের উদাহরণ দেয়ার সম্ভবতঃ কয়েকটি কারণ আছে; এগুলোর **প্রথম কারণ** হচ্ছে এই যে, কালিমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও সুদৃঢ় শিকড়বিশিষ্ট। দুনিয়ার বালামুসীবত ও দুঃখ– কষ্ট এই ঈমানকে দুর্বল করতে পারে না বরং আরও সুদৃঢ়, সুসংহত ও মজবুত করে। সাহাবী ও তাবি'য়ীগণ; এমনকি সকল যুগের খাঁটি মুসলিমদের এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, তারা ঈমানের মোকাবেলায় জীবন, সম্পদ ও কোন কিছুর তোয়াক্কা করেননি। ঈমানের সামনে সবকিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। এর **দ্বিতীয় কারণ** হচ্ছে, মু'মিনগণের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার যাবতীয় নোংরামী ও পঙ্কিলতা থেকে সবসময় দূরে থাকেন যেমন ভূপৃষ্ঠের দুষণ ও ময়লা– আবর্জনা উঁচু গাছকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি বৈশিষ্টই হচ্ছে, আল্লাহর বাণীঃ أَصْلُهَا ثَابِتٌ 'যার শিঁকড় সুদৃঢ়' এর দৃষ্টান্ত। **তৃতীয় আরেকটি কারণ** হচ্ছে, খেজুর গাছের শাখা– প্রশাখা যেমন উর্ধ্বমূখী, মু'মিনগণের ঈমানের ফলাফল ও তাদের সৎকর্মসমূহও আকাশের দিকে উত্থিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী এর সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}

'পবিত্র বাণীসমূহ তাঁরই দিকে উত্থিত হয় এবং সৎকর্ম, তিনি তা উন্নীত করেন', [ফাতির– ৩৫: ১০]। অর্থাৎ মু'মিনগণ আল্লাহ সুবহানাহুর যেসব যিকর, তাসবীহ– তাহলীল, কুরআন অধ্যয়ন, উন্নত চরিত্র এবং উত্তম শিষ্টাচার ইত্যাদি সৎকর্ম করে, সেগুলো সকাল–সন্ধ্যা

আল্লাহর কাছে পৌঁছতে থাকে। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, ভাল কথা হচ্ছে, আল্লাহর যিকর, আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহর ফারয আদায় করা, [তাফসীরুত তাবারী ২০/৪৪৪]। বিভিন্ন তাফসীরে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাসবীহ ও যিকর– আযকার করবে, কিন্তু আল্লাহর ফারয কাজগুলো আদায় করবে না, তার মুখের কথা ও যিকর তার 'আমলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন সেটা তার ধ্বংসের কারণ হবে। আল–হাসান আল–বাসরী ও কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা 'আমল ছাড়া কোন কথা কবুল করেন না। যে ভাল বলে এবং ভাল 'আমল করে সেটাই শুধু আল্লাহ কবুল করেন, [তাফসীরুত তাবারী ২০/৪৪৫, তাফসীরুল বাগাভী ৩/৬৯০]।

এরপর মহান আল্লাহর বাণী, **تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا** **'তার রবের অনুমতিক্রমে যা সর্বদাই তার ফল দান করে।** খেজুর গাছের সাথে মু'মিনদের সাদৃশ্যের **চতুর্থ কারণটি** হচ্ছে, খেজুর গাছের ফল যেমন সবসময় ও সব মৌসুমে দিনরাত খাওয়া হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সবসময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। আবার খেজুর গাছের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক কথা ও কাজ, চালচলন, কৃষ্টি–কালচার, আচার– আচরণ ও ন্যায়–নিষ্ঠ এবং এ সবের প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক, [দেখুন: ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন ১/১৩৩– ১৩৪, কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/১৩২৮]। অন্যভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরলে আর স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, সেটি একটি ফলদায়ক ও ফলপ্রসু কালিমা। কোন ব্যক্তি বা জাতি–গোষ্ঠী এ কালিমার ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থ গড়ে তুললে প্রতি মুহূর্তে সে তার সুফল লাভ করতে থাকে। সেটি চিন্তাধারায় পরিপক্কতা ও পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, জীবন ধারায় মজবুতী, চরিত্রে পবিত্রতা, আত্মায় প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধতা, শরীরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, আচরণে মাধুর্য, ব্যবহার ও লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সাদাচার, কৃষ্টিতে ঔদার্য ও মহত্ব, সভ্যতায় ভারসাম্য, অর্থনীতিতে ন্যায়–ন্যায্যতা, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে সৌজন্য, সন্ধিতে আন্তরিকতা এবং চুক্তি ও অংগীকারে বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। সেটি এমন একটি পরশ পাথর যার প্রভাব কেউ যথাযথভাবে গ্রহণ করলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়, [তাফহীমুল কুরআন ৬/১৮৮]।

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী, **وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** **'আর আল্লাহ মানুষের জন্য উদাহরণসমূহ পেশ করে থাকেন; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে',** । অর্থাৎ আল্লাহ যেসব বিষয় তাদেরকে আদেশ করেছেন এবং যেসব কিছু থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন, সেসব বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এই উদাহরণ পেশ করেছেন; কেননা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ সহজবোধ্য হয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু যে বিষয়টিকে তাঁর বান্দাদের সামনে স্পষ্ট করতে চান, তা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে যায়। এটি আল্লাহর তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া এবং তাঁর উত্তম শিক্ষানীতি, [শাইখ আস– সা'দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৩৭৯]।

এ আয়াতগুলোতে 'কালিমায়ে তাইয়্যেবা' বলে ইসলামের মূল বার্তা আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের ঘোষণাকে উত্তম গাছ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে যার শিকড় ও মূল যমীনের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ও বিস্তৃত হওয়ার কারণে অত্যন্ত মজবুত, এর ভিত্তি ও পাতাটন খুবই শক্ত ও স্থায়ী। একইভাবে এর সমান্তরালে মাটির উপরি ভাগে এ গাছের শাখা প্রশাখা বিস্তর দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত ও প্রসারিত। এটি একটি বিশাল মহিরুহ এক বৃহদাকারের গাছ, যার স্থায়ীত্ব এতটাই অনড়, দৃঢ় ও শক্ত যে, কোন ঝড়– ঝাপটা ও প্রলয়ংকরী টর্নেডো এ গাছকে ভেঙ্গে ফেলা ও উপড়ে ফেলা দুরে থাক এটাকে সামান্য টলাতেও পারে না। ঠিক আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদ এমনি একটি দৃঢ়, শক্ত ও মজবুত বিশ্বাসের নাম যে, কোন কিছুই এ 'আকীদা–বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার করা বা একে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। একইভাবে এই তাওহীদী 'আকীদা–বিশ্বাসে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী মুসলিম জাতিও এমনটিই শিষা ঢালা প্রাচীরের মত একটি সুদৃঢ়, সুসংগঠিত মজবুত জাতি, যাদের রয়েছে মানব ইতিহাসের সূচনা থেকে এক সোনালী দীর্ঘ ইতিহাস এবং শ্বাশ্বত ও অনুপম এক আদর্শ এবং অনন্য অনন্য ঐতিহ্য। যাদের শিকড় মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত ও বিস্তৃত একইভাবে তাদের চির শ্বাশ্বত আদর্শ ও সেই ভিত্তিক বিশাল কার্যক্রম, যা আসমান–যমীন ও দিগ–দিগন্তে সুবিস্তৃত। সুতরাং তাওহীদী 'আকীদা– বিশ্বাস এবং এর নিষ্ঠাবান ধারক–বাহক মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করা, বিনাশ করা এবং এর মূলোৎপাটন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর তাবত কুফরী ও তাগুতী শক্তি তাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে ইসলাম ও মুসলিম জাতির মূলোৎপাটন করতে পারবে না। মানব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই এটা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত পথ ও হিদায়াত ও এর বিপরীত তাগুত ও শাইতানী শক্তির এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব রয়েছে। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর দীনের বিরোধী শক্তি পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যত চেষ্টা–প্রচেষ্টা, অর্থ শক্তি, সমরিক শক্তি, বুদ্ধি শক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করেছে, এগুলো যদি অন্য কোন ধর্ম, মতবাদ, দর্শন ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো তাহলে অনেক আগেই পৃথিবী থেকে সেগুলো চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যেত। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম জাতি এক দুর্জয় আদর্শ ও অজেয় জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহর ঘোষণাই চিরসত্য যে, তাঁর প্রদত্ত আদর্শই সমুন্নত আর তাঁর দুশমনদের সবকিছু অধপতিত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

'আর তিনি কাফিরদের কথাকে নীচু করে দেন আর আল্লাহর কথাই সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়', [আত্– তাওবাহ– ৯: ৪০]।

আল্লাহ সুবহানাহুর পবিত্র বাণী, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ 'আর অপবিত্র বাক্যের তুলনা এক মন্দ গাছ, যা ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্নকৃত, যার কোন স্থায়িত্ব নেই'। كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ 'অপবিত্র বাক্য' উপর্যুক্ত 'কালিমায়ে তাইয়েব্যাহ' বা 'পবিত্র বাক্য' এর বিপরীত শব্দ। যদিও সব সত্য বিরোধী ও মিথ্যা কথার ওপর এটি প্রযুক্ত হতে

পারে তবুও এখানে খারাপ গাছের দ্বারা এমন প্রতিটি বাতিল 'আকীদা বুঝায়, যার ভিত্তিতে মানুষ নিজের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ বাতিল 'আকীদা নাস্তিক্যবাদ, নিরীশ্বরবাদ, দীনদ্রোহিতা, অবিশ্বাস, কুফর, শিরক, পৌত্তলিকতা বা এমন কোন চিন্তাধারাও হতে পারে, যা নাবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আসেনি, [দেখুনঃ তাফহীমুল কুরআন ৬/১৮৮]। এর দ্বারা তাওহীদ ও কালিমা তাইয়্যেবা বিরোধী কাফির– মুশরিকদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। কালিমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা তাওহীদের ঘোষণা, তেমনি 'কালিমায়ে খাবীসা' এর অর্থ কুফরী–শিরকী কথাবার্তা ও কুফরী কার্যক্রম, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/৩৮, তাফসীরুল কুরতুবী ৯/৩৬১]। আয়াতে উল্লেখিত মন্দ গাছটির অসারতা এ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর শিকড় মাটির গভীরে বেশী প্রবেশ করতে পারে না। ফলে এটি নড়বড়ে ও দুর্বল হয়। সামান্য বাতাসে এদিক সেদিক দুলতে থাকে এবং যে কেউ ইচ্ছে করলে গাছটিকে অতি সহজে শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে পারে, [তাফসীরুল কুরতুবী ৯/৩৬২]। কাফির মুশরিকদের বিশ্বাস ও কাজকর্মকে এ মন্দ গাছের সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস বলেন, শিরক ও কুফরীর কোন মূল্য নেই, এর স্থায়িত্ব নেই এবং এর কোন প্রমাণাদিও নেই, যার উপর ভিত্তি করে কাফির ও মুশরিকগণ এটিকে ধারণ করবে। তাদের কাজকর্মের কোন কল্যাণকর দিক নেই। অপরদিকে তাদের ভাল কথা ও ভাল কাজকর্মও উপরের দিকে উঠে না এবং আল্লাহ তা গ্রহণও করেন না, [তাফসীরুত তাবারী ১৬/৫৮৬, আল–বাগাভী ৩/৩৮, তাফসীরুল কুরতুবী ৯/٣٦٢, ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর, আর দেখুনঃ কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ১/ ১৩২৯]। 'অসৎ বা অপবিত্র বাক্য' এর অর্থ বাতিল 'আকীদা– বিশ্বাস। এর বিশ্লেষণে আরো বলা যায় যে, বাতিল 'আকীদা ও চিন্তাধারা যেহেতু মহান আল্লাহর নিকট থেকে আগত সত্য বিরোধী, তাই প্রাকৃতিক নিয়ম ও আইন– কানুন (اَلسُّنَنُ الْكَوْنِيَّةُ) কোথাও

> সুতরাং তাওহীদী 'আকীদা–বিশ্বাস এবং এর নিষ্ঠাবান ধারক–বাহক মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করা, বিনাশ করা এবং এর মূলোৎপাটন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর তাবত কুফরী ও তাগুতী শক্তি তাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে ইসলাম ও মুসলিম জাতির মূলোৎপাটন করতে পারবে না। মানব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই এটা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত পথ ও হিদায়াত ও এর বিপরীত তাগুত ও শাইতানী শক্তির এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব রয়েছে।

তার সাথে সহযোগিতা করে না। বিশ্ব– জগতের প্রতিটি অণুকণিকা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জমিতে তার বীজ বপন করার চেষ্টা করলে জমি সবসময় তাকে উদগীরণ করার জন্য তৈরী থাকে। আকাশের দিকে তার শাখা প্রশাখা বেড়ে উঠতে থাকলে আকাশ তাদেরকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। পরীক্ষার কারণে মানুষকে যদি নির্বাচন করার স্বাধীনতা ও কর্মের অবকাশ না দেয়া হতো, তাহেল এ অসৎজাতের গাছটি কোথাও গজিয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দান করেছেন, তাই যেসব নির্বোধ লোক প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়ে এ গাছ লাগাবার চেষ্টা করে তাদের শক্তি প্রয়োগের ফলে জমি একে সামান্য কিছু জায়গা দিয়েও দেয়, বাতাস ও পানি থেকে সে কিছু না কিছু খাদ্য পেয়েই যায় এবং শূন্যও তার ডালপালা ছড়াবার জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু জায়গা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন এ গাছ বেঁচে থাকে ততদিন তিতা, বিস্বাদ ও বিষাক্ত ফল দিতে থাকে এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই অকস্মিক ঘটনাবলীর এক ধাক্কাই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে, [তাফহীমুল কুরআন ৬/১৮৮। অন্যান্য আয়াতেও এ কথার আর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ সুবহানাহুন বলেন,

{مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ}

'যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমা হল, তাদের কাজগুলো ছাইয়ের মত, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি', [ইবরাহীম– ১৪: ১৮]। অর্থাৎ কাফিরদের কার্যকলাপ যদি বাহ্যত ভালও হয় আল্লাহ তা'আলার কাছে তা গ্রহণীয় নয়। সবই অকেজো ও অর্থহীন। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছে সবই বৃথা ও নিষ্ফল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}

'আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব', [ফুরকান– ২৫: ২৩]। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

{مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}

'এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বায়ূ, যা আঘাত করে ঐ জাতির শস্যক্ষেতে, যারা নিজেদের ওপর যুলম করেছে; অতঃপর তা ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুলম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি যুলম করে', [আলে 'ইমরান– ৩: ১১৭]।

শিক্ষাসমূহ: উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নিম্নে কতিপয় শিক্ষা তুলে ধরা হলো;

এক. 'উত্তম বাণী' দ্বারা কালিমাতুত তাওহীদ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদের ঘোষণার বাণী হচ্ছে একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, 'আল্লাহ ছাড়া সত্য আর কোন ইলাহ নেই'। এই ঘোষণাই চিরন্তন সত্য এবং এর ভিত্তিতেই পৃথিবীর সকল ভাল কথা, কাজ, আচরণ নির্ধারিত হয়। এর বাইরে সবই অসত্য, মিথ্যা ও বাতিল। প্রত্যেক মানুষকে বিশেষ করে মু'মিনদেরকে এ সত্যটি উপলব্ধি ও বিশ্বাস করতে হবে।

দুই. ইসলামের ভিত্তি তাওহীদ এমনই একটি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় বৃক্ষ, যার শিকড় মাটির গভীর অভ্যন্তরে প্রোথিত এবং যার শিকড়গুলো মাটির নীচে বিস্তৃত হয়ে আর মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার তার শাখা-প্রশাখাগুলো প্রশস্ত দিগন্ত জোড়া আসমানে বিস্তৃত। এই বিশাল শক্তিশালী মহিরুহ গাছটির মূলোৎপাটন করা এবং শিকড়শুদ্ধ তা উপড়ে ফেলা আদৌ সম্ভব নয়।

তিন. ইসলাম ও মুসলিম জাতি পৃথিবীর জন্য উপকারী, পৃথিবীর সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই তাদের কাজ। তাই যাবতীয় ও সর্বজনীন সকল সৎকর্ম আল্লাহর দিকে উঠে যায় এবং মহান আল্লাহ নিজ গুণে সেগুলোকে গ্রহণ করেন। মু'মিন- মুসলিমদের এ জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

চার. কুফর, শিরক ও সমস্ত বাতিল দর্শন ও বিশ্বাস হচ্ছে অপবিত্র ও অসৎ বাক্য, যেগুলোর উদাহরণ দুর্বল গাছের মত, যার শিকড় মাটির উপরে ভাসমান, যা সহজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সামান্য বাতাসেই শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়। ঠিক তেমনি কুফরী শক্তি পৃথিবীতে আসলে একটি ঠুনকো শক্তি, যা পদদলিত হওয়ার জন্যই আছে, অধপতিত হওয়াই যার পরিণতি। এ সত্য উপলব্ধি করার দৃঢ় ঈমানের ধারকদের একান্ত কর্তব্য।

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধনীতি

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যুদ্ধের ক্ষেত্র

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রও নির্ণিত হয়। সেগুলো হলো,

(ক) **জুলুম-নির্যাতনের প্রতিরোধ করা :** যাদের প্রতি নিপীড়ন-নির্যাতন ও জুলুম করা হয়েছে অথবা অন্যায়ভাবে তাদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদেরকে জুলুমের প্রতিকারার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কারণ তারা অত্যাচারিত। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তারা ঐ সব লোক, যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাদের অপরাধ এই যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। যদি আল্লাহ তাদের এক দলের দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে তারা খানকাসমূহ, উপসানালয় ও মসজিদসমূহ-যেগুলোতে আল্লাহর নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয় তা ধ্বংস করে ফেলত, ।" (২২, সূরা আল্‌হাজ্ব : ৩৯-৪০)

(খ) আগ্রাসন ও আক্রমণের জবাবদান : যারা আক্রমণ করে এবং যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম ফরজ করা হয়েছে। এরা মূলত সন্ত্রাসী ও যুদ্ধবাজ। এদেরকে প্রতিহত করা না গেলে আল্লাহর এ যমীন জুলুম-নির্যাতন, খুন-খারাবী ও ফিৎন-ফাসাদে ভরে উঠবে। পৃথিবীকে শান্তিপ্রিয় মানুষের নিরাপদ আবাসে পরিণত করার জন্য অশান্তি সৃষ্টিকারী এ চক্রটিকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য মুক্তিকামী ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী মুসলিমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্যই আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ হল,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ১৯০)

(গ) সাধারণ ও সর্বব্যাপক যুদ্ধ : এটি মূলতঃ মুশরিকী আদর্শের বিরুদ্ধে ইসলামী আদর্শের লড়াই। এজন্যই এ লড়াই পরিচালিত হয়ে থাকে সমগ্র মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। কারণ

ইসলামের মূল কথা হলো আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে নেয়া। এটি একটি সার্বিক মহাসত্য এবং সমগ্র মানব সমাজের জন্য তা প্রযোজ্য। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের অধীনে আনয়ন করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারলেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে। এজন্যই ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের সত্যিকার আযাদী অর্জিত হতে পারে।

শাসক-শাসিত, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের জন্যই একমাত্র আল্লাহর আইন-ই নিরপেক্ষ ও কল্যাণকর হতে পারে। আর এ কল্যাণ লাভ করতে হলে সকল শ্রেণীর মানুষকেই এ আইন সমানভাবে মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মূলতঃ বিশ্ব শান্তি ও মানবতার কল্যাণের বিরুদ্ধেই অবস্থান গ্রহণ করে।

অধিকন্তু এ গোষ্ঠী রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ এবং নানাবিধ উপায়ে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে অথবা এমন পরিবেশ ও অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে, যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে ভয় পায়। প্রতিটি মানুষের জন্য চাপমুক্ত পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল পবিবেশের প্রয়োজন, যাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হলে ইসলাম বিরোধী মহল তার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ অথবা তাকে ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকার বাধা প্রদান করতে না পারে। যদি কেউ বাধা প্রদান করে, তাহলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কর্তব্য মনে করে এবং বাধা প্রদানকারীর মৃত্যুবরণ অথবা বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত বিরামহীন গতিতে এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম হিসেবে মেনে নেয় না, আর সত্য-সঠিক দ্বীনকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া কর প্রদান করে।" (৯, সূরা আত্‌তাওবা : ২৯)

যুদ্ধের হুকুম

যে যুদ্ধের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ হামলা বা যুদ্ধের জবাবে এবং ইসলামের দা'ওয়াতী কাজে বা ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, তার হুকুমের ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিম বলেন, "দু'মতের এক মতানুযায়ী এ ধরনের যুদ্ধ ফরজে 'আইন (ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ) অথবা প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ফরজে কিফায়া (সামষ্ঠিকভাবে ফরজ, যা একটি দল পালন করলেই চলে)।"[১]

এ দু'টি মতের সমন্বয় সাধন করে ইবনুল কায়্যিম বলেন, "প্রকৃত কথা হলো মূল বা সামগ্রিক

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮।

জিহাদ ফরজে আইন। আর তা হয়ে থাকে অন্তঃকরণ, মুখ, অর্থ এবং হাতের দ্বারা। এ ধরনের জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। কিন্তু জান দ্বারা জিহাদ করা (অর্থাৎ স্বশরীরে জিহাদের ময়দানে জিহাদ করা) ফরজে কিফায়া। তবে অর্থের দ্বারা জিহাদ করা ফরজ কিনা সে ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো তা ফরজ। কারণ আল কুরআনে জান এবং মালের দ্বারা জিহাদ করার জন্য একই আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা বেড়িয়ে পর হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় এবং তোমাদের মাল ও জনা দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পার।" (৯, সূরা আত্তাওবা : ৪১)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি, গোনাহ্ মাফ এবং জান্নাতে প্রবেশকে এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ – تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ – يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ –

'হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দেবনা, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত দেবে? তা হলো, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাহে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে পার। (এর দ্বারা) আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর বসবাসের জান্নাতে রয়েছে উত্তম আবাসমূহ। মূলতঃ এটাই বড় সফলতা।" (৬১, সূরা আস্আস্স্াফ : ১০-১২)।

আল্লাহ তা'আলা আরো অবহিত করেছেন যে, যারা একাজ করবে, তাদেরকে কাংখিত সাহায্য ও নিকটতর বিজয় দান করবেন। আল্লাহ বলেন,

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

"আর অন্য আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে দেয়া হবে যা তোমরা পছন্দ কর, আর তা হলো আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়।" (৬১, সূরা আস্আস্স্াফ : ১৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।" (৯, সূরা

আত্‌তাওবা : ১১১)[2]

ইসলামের যুদ্ধনীতি

ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা পেশ করা হলো, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে ইসলামের যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

সামর্থ ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থাকা : মক্কী যুগে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি এবং মদীনায় হিজরতের পরও কিছুকাল যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। এর কারণসমূহ ইত:পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, সে সময়ে কাফির ও মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিমত্তা ও জনবলের অপ্রতুলতা। ইসলাম যে কোন কাজের জন্য সমার্থকে বিবেচনায় আনে। সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব ইসলাম কারো উপর আরোপ করে না। আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর সাধ্যের অধিক দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২৮৬)

যুদ্ধের ক্ষেত্রে এ সামর্থ আরো অধিক গুরুত্বের দাবীদার। কারণ প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ ও উপায়-উপকরণ ব্যতীত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে অযথা শক্তিক্ষয় এবং জানমালের ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। এমনকি এ ধরনের হঠকারী ও অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের কারণে ইসলামী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, অন্তত: পক্ষে ইসলামী আন্দোলন চরম ঝুকির সম্মুখীন হয়ে বহুকাল পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই বিজয়লাভের বা টিকে থাকার মত শক্তি-সামর্থ ও অবস্থান সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়না। ইবনুল কায়্যিম ইসলামী আন্দোলনের এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের আগে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করা খুবই জরুরী। কারণ তাদেরকে মোকাবিলা করতে হয় এমন এক জাহিলী সমাজ ব্যবস্থার সাথে যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ ব্যাপারে সায়্যিদ কুতুব বলেন, "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় জাহিলিয়াত সমাজের উপর সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কাজেই ইসলামী আন্দোলন পরিচানার জন্য জাহিলিয়াতের প্রতিষ্ঠিত শক্তির তুলনায় সমপরিমান উপায় উপকরণ অপরিহার্য। তাই ইসলাম তাবলীগ ও প্রচারের মাধ্যমে চিন্তাধারা ও 'আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন করে এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যে পার্থিব শক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে জিহাদ পরিচালনা করে। কারণ ঐ জাহিলিয়াত পরিচালিত সমাজ 'আকীদা ও চিন্তার বিশুদ্ধকরণ কাজে বাধা প্রদান করে। পার্থিব উপকরণ ও বিভ্রান্তিকর কার্যসূচী অবলম্বন করে মানুষকে জাহিলী সমাজের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করে। এর ফলে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের নিকট মাথা নত করে বাস করা ছাড়া সমাজের আর কোন উপায় থাকে না। তাই ইসলামী আন্দোলন পার্থিক শক্তিপুষ্ঠ জাহিলিয়াতের মূলোচ্ছেদ করার অভিযানে শুধু মাত্র দা'ওয়াত ও

---

২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯

তাবলীগকেই যথেষ্ট বিবেচনা করতে পারে না।"[3]

স্থান-কাল ও অবস্থা ভেদে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রদান : ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে স্থান-কাল-পাত্র অবস্থা ও অবস্থান এবং পারিপার্শিক অবস্থার আলোকে অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে আন্দোলনের কর্মসূচী দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিরোধীদের উপায় উপকরণ ও শক্তিমত্তা এবং সে তুলনায় নিজেদের উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থের হিসাব-কিতাব করেই অগ্রসর হতে হবে। বিজয় হওয়া অথবা অন্তত: টিকে থাকার মত অবস্থা না হলে সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচীকে ইসলাম অনুমোদন করে না। এ অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইবনুল কায়্যিমের মতে নিষিদ্ধ।[4]

তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) নবুওয়্যাত লাভের পর দীর্ঘ ১৩ বছর যুদ্ধ বা জিযিয়া ছাড়াই শুধুমাত্র দা'ওয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে সতর্ক করেছেন। এ সময় তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল হাত গুটিয়ে রাখা, ধৈর্যধারণ করা ও ক্ষমা প্রদর্শনের।"[5] তিনি আরো বলেন, "যখন রাসূল (সা.) মদীনায় স্থিরভাবে অবস্থান নিলেন এবং আল্লাহ তাকে স্বীয় মদদ ও মুমিন বান্দাদের দ্বারা সাহায্য করলেন এবং শত্রুতার পর তাদের পরস্পরের হৃদয়কে জুড়ে দিলেন, গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে আল্লাহর সাহায্যকারী ও ইসলামের রক্ষকগণ তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করল, তারা তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করল এবং পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও নিজের উপর তাঁকে অগ্রাধিকার দিল, তখন আরববাসী ও ইহুদীরা একই ধনুক হতে (সম্মিলিতভাবে) মুসলিমদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং শত্রুতা ও যুদ্ধের খড়গ শানিত করল ও তাকে নিয়ে চুতুর্দিকে হৈ হাঙ্গামা শুরু করল। সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের শক্তি মত্তা মজবুত ও বাহু সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ, ক্ষমা ও উদারতায় নির্দেশ দিলেন। অতঃপর যখন শক্তি সামর্থ পরিপক্ক হলো, তখন তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো।"[6] প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ অর্জনের পূর্বে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নিজেকে ধ্বংস কূপে নিক্ষেপ করার শামিল।

এ আন্দোলনের কোন্ স্তরে কি পক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করে কর্মসূচী দিতে না পারলে বিপর্যয়ের সমুহ সম্ভাবনা থাকে। এমনকি এ অবস্থায় আন্দোলন সম্পুর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এ প্রসঙ্গে সায়্যিদ কুতুব বলেন,

"এটা একটা বাস্তবমুখী আন্দোলন। এ আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি ধাপে তার চাহিদা মোতাবিক উপকরণ সংগ্রহ করে নেয় ও পরবর্তী ধাপের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বাস্তব সমাস্যাবলীকে নিছক উত্তম নীতিমালার সাহায্যে প্রতিরোধ করার কোন অবাস্তব ব্যবস্থা এ দ্বীনে নেই এবং এ আদর্শ আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানে কিছু অপরিবর্তনীয় ছক কাটা পন্থার উপরও নির্ভর করে না।"[7]

সামর্থ অনুযায়ী প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ : মদীনায় হিজরতের পর যখন মুসলিমদের

---

৩. সায়্যিদ কুতুব শহীদ, মা'আলিম ফিত্ তারীক, অনুবাদ, 'আব্দুল খালিক, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, পৃ. ৬৯।
৪. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৫৮।
৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮১।
৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮।
৭. সায়্যিদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ ও মজবুত অবস্থান তৈরী হয়েছে, তখন তাদেরকে আর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং তাদের প্রতি যে জুলুম করা হয়েছে, তার প্রতিকারার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে তখন পর্যন্ত যুদ্ধ ফরজ করা হয়নি, বরং তা শুধু মাত্র অনুমতির পর্যায়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু যখনি বিরোধী শক্তি ইসলাম ও মুসলিমদেরকে নির্মূল করার জন্য আগ্রাসন চালিয়েছে এবং অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছে, তখন সে আগ্রাসনকে প্রতিহত করা ও আক্রমণের জবাবে প্রতি আক্রমণকে মুসলিমদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং তা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কারণ এমতাবস্থায় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করলে জাতি হিসেবে মুসলিমদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াত হলো :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

"যাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে প্রতি আক্রমণের অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা নির্যাতিত এবং আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তারা হলো সেই সব লোক, যাদেরকে 'আমাদের প্রভূ আল্লাহ' শুধু এ ঘোষণা দেয়ার কারণে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।" (২২, সূরা আল্‌হাজ্জ : ৩৯-৪০) এ আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা :

(ক) মুসলিমদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি বেদখল করে নেয় এবং তাদের অধিকার হরণ করে।

(খ) মুসলিমদের ধর্মীয় 'আকীদা-বিশ্বাসের জন্য তাদের উপর অত্যাচার চালায়। এমতাবস্থায় তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ।

এ স্তরে অন্য যে আয়াতটি নাযিল হয়, তাহলো,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"তোমাদের উপর যারা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তাদের সাথে তোমরাও যুদ্ধ কর। তবে সীমা লংঘন করো না। কারণ আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তাদের যেখানে পাও হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে, সেখান থেকে তাদেরকে বহিস্কার করে দাও। কারণ অরাজকতা হত্যার চেয়েও ভয়াবহ।" (২, সূরা আল্‌বাকারাহ : ১৯০-১৯১)

এ আয়াতের হুকুম হলো :

(ক) মুসলিমদের উপর যখন কেউ আক্রমণ করে এবং জুলুম ও নির্যাতন চালায়, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য।

(খ) আগ্রাসী শক্তি জয়লাভ করে যে ভূখণ্ড থেকে মুসলিমদের বের করে দেয়, অথবা মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে, সে হারানো ভূখন্ড ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা

পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলিমদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা আসলে যে সব জায়গা থেকে শত্রুরা তাদেরকে বহিস্কার করেছিল, সেসব জায়গা থেকে শত্রুদেরও বের করে দেয়া উচিৎ।

এ যুদ্ধ মূলত: প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। জুলুম ও আগ্রাসনের জবাবে এ যুদ্ধকে মুসলিমদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন, "অত:পর যারা তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় বা আক্রমণ করে, তাদের সাথে যুদ্ধ করাকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে, তবে যারা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, তাদের সাথে নয়।"[৪]

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের মূল কথা

ক. জান-প্রাণের নিরাপত্তা বিধান : ইসলাম প্রতিটি মানুষের জীবন ও রক্তকে পবিত্র ও সম্মানার্হ বলে ঘোষণা করেছে। বেঁচে থাকার অধিকারই হলো মানুষের প্রথম ও প্রধান নাগরিক অধিকার। আর অন্যকে বাঁচতে দেয়া হলো নাগরিক কর্তব্যসমূহের মধ্যে প্রধান কর্তব্য। ইসলাম বেঁচে থাকার অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং জান-প্রাণের নিরাপত্তাকে সর্বাধিক নিশ্চিত করতে প্রয়াসী । এজন্য যারা মানুষের বেঁচে থাকার পথকে নির্বিঘ্ন করে ইসলাম তাদেরকে মানবতার বন্ধু এং যারা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করে, তাদেরকে মানবতার দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"এজন্যই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ বা পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিরই জীবন রক্ষা করে।" (৫, সূরা আল্‌মায়িদা : ৩২)

ইসলাম অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে এবং এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'হে নবী আপনি বলুন, এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পড়ে শুনাই, যেগুলো তোমাদের রব তোমাদের উপর হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করোনা, পিতা-মাতার সাথে সদয় আচরণ করো, তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না; আমিই তোমাদের এবং তাদেরকে রিযিক দিই। নির্লজ্জতার নিকটেও যেও না, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। আল্লাহ যে প্রাণকে সম্মানার্হ করেছেন, যাকে হত্যা

---

৮. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৫৮।

করা হারাম করেছেন, তাকে ন্যায়ভাবে ব্যতীত হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদেরকে এ সকল নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হয়।" (৬, সূরা আল্‌আন'আম : ১৫১)

ইসলাম জান-প্রাণ ও রক্তকে শুধু সম্মানার্হ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি। অধিকন্তু এ জান-প্রাণ ও রক্তের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। এ জন্য কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে উদ্যত হলে তা প্রতিহত করার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার জন্য বদলা হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

"তোমাদের উপর হত্যার ক্ষেত্রে বদলা হত্যার বিধান দেয়া হলো।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ১৭৮)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

"আর আমি তাওরাতে তাদের জন্য প্রাণের বদলে প্রাণ হননের বিধান দিয়েছি।"(৫, সূরা আল্‌মায়িদা : ৪৫)

কিসাস অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যার বিধান দেয়ায় জান-প্রাণের নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয়েছে। কারণ তা না হলে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ত এবং যত্র-তত্র হত্যাকান্ড সংঘঠিত হতো। হত্যার বদলে হত্যার বিধান থাকায় হত্যা করলে নিজের প্রাণ যাবে, এ ভয়ে মানুষ সহজে হত্যা করতে সাহস পাবে না। ফলে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। এজন্য হত্যার বদলে হত্যার মধ্যেই মানুষের জীবন নিহিত রয়েছে বলে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"হে বুদ্ধিজীবি সমাজ, তোমাদের জন্য কিসাস অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা- এ বিধানের মধ্যেই জীবন নিহিত রয়েছে।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ১৭৯)

কিসাস এর এ বিধান ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি তা সমষ্ঠির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন জাতি বা গোষ্ঠি যখন সীমালংঘন করে তখন তাদের অরাজকতা, অনিষ্টকারিতা এবং খুন-খারাবীও হয়ে থাকে সীমাহীন। তাদের বাড়াবাড়ি ও অরাকজতা একটি সীমাহীন আপদ হয়ে দেখা দেয় এবং এর দ্বারা কোটি কোটি মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। বহু দেশ ও জাতি এর দ্বারা শোচনীয় দুর্দশায় পতিত হয় এবং গোটা সমাজ ও সভ্যতা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। গোষ্ঠীসমূহের বাড়াবাড়ি বহু বিপর্যয়, হাঙ্গামা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। তারা জাতিগুলোর উপর নিষ্ঠুর শোষণ, লুন্ঠন ও দস্যুবৃত্তি চালায়। এদের মধ্যে আবার কোন কোন গোষ্ঠী সাম্রাজ্য লোভী হয়ে থাকে। তারা দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোর স্বাধীনতা হরণ করে নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের উপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায়। কোন কোন জালিম গোষ্ঠী ধর্মের ব্যাপারেও জোর-জবরদস্তি চালায় এবং হীন স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে আল্লাহর বান্দাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত করে এবং লোকদেরকে স্বধর্ম ত্যাগ করে হানাদার গোষ্ঠীর ধর্ম গ্রহণ করার

জন্য চাপ প্রয়োগ ও নির্যাতন শুরু করে। এ সকল আগ্রাসী শক্তির জুলুম শোষণ ও নির্যাতন থেকে মানবতাকে মুক্ত করা এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে ইসলাম ফরজ করে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন, "অতপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তিনি (নবী সা.) যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করেন, যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে আসে এবং যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ না করে বরং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, তাদের সাথে যেন যুদ্ধ না করেন।"[9] আগ্রাসী শক্তির হামলাকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধকে ইসলাম মুসলিমদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। কারণ তা নাহলে মানুষের শান্তি নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে। এ প্রসংগে সায়্যিদ আবুল 'আলা মওদূদী (রহ.) বলেন, "এমন সময় ঐ জালিমদের রক্তে পৃথিবীকে লাল করে দেয়াই হয়ে দাড়ায় মানবতার শ্রেষ্ঠতম সেবা। হাঙ্গামা-বিপর্যয় ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অনাচার থেকে মজলুম ও অসহায় মানুষকে মুক্তি দেয়া এ সময়কার প্রধানতম কর্তব্য। কারণ তারা শয়তানের অনুচর হয়ে আদম সন্তানদের উপর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত বিপর্যয় ডেকে আনে। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে মানুষ নয়। তাই মানবোচিত সহানুভূতির যোগ্য বলেও তারা বিবেচিত হতে পারে না। মানুষের আকারে তারা শয়তান এবং মানবতার সত্যিকার দুশমন। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর কোন কারণ যদি থেকেও থাকে, তবে সে সহানুভূতি তাদের কলংকময় জীবনকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মধ্যেই নিহিত। তারা নিজেদের অনাচারের দরুণই নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার হারায়। তাদের এবং যারা তাদের অনাচার দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মদদ যোগায়, তাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনই অধিকার নেই। তারা আসলে মানব সমাজদেহের এমন একটা অংগ, যা বিষাক্ত ও দূষিত উপকরণে ভর্তি হয়ে গেছে, যাকে বহাল রাখলে অবশিষ্ট গোটা দেহে পঁচন ধরার ও নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। এজন্য ঐ পঁচা, বিষ্ঠা ও বিনাশক অংগকে কেটে ফেলে দেয়াই বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক।"[10]

এসকল দুরাচার, জালিম ও অত্যাচারী লোকদেরকে আল্লাহ যদি সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের দ্বারা প্রতিহত ও পরাভূত না করতেন, তাহলে দুনিয়া ফিৎনা-ফাসাদে ভরে যেত। এমনকি অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতা এতটাই প্রবল হতো যে, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতো এবং উপাসানালয়গুলো পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলা হতো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

"আল্লাহ যদি মানুষের একদল দ্বারা অন্যদলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে দুনিয়া ফিৎনা-ফাসাদে ভরে যেত; কিন্তু আল্লাহ বিশ্ব বাসীর উপর খুবই অনুকম্পাশীল।" (২, সূরা আল্‌বাকারা : ২৫১) অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ

---

৯. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৮১।

১০. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদী, আল জিহাদ ফিল ইসলাম, ভাষান্তর আকরাম ফারুক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৪ সং, ২০০২ খৃ.) পৃ. ৩৮।

كَثِيرًا

"যদি একদল লোকের দ্বারা অন্যদল লোককে প্রতিহত করার খোদায়ী ব্যবস্থা না থাকতো, তাহলে মন্দির, গীর্জা ও যাবতীয় উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়, ধ্বংস করে দেয়া হতো।" (২২, সূরা আল্‌হাজ্জ : ৪০)

ইসলাম এ সকল অরাজকতা সৃষ্টিকারী ও ফিৎনাবাজদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়, যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা নৈরাজ্যবাদী জালিমরা অস্ত্র সংবরণ করে। আল্লাহর ভাষায়,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"আর অরাজকতা নির্মূল হয়ে দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।" (৮, সূরা আল্‌আনফাল : ৩৯)

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

"অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, যতক্ষণ না তারা পরিপূর্ণভাবে পরাভূত হয়। তৎপর তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। এরপর হয় তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। এ যুদ্ধ চালিয়ে যাও ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে।" (৪৭, সূরা মুহাম্মাদ : ৪)

খ. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান : প্রতিরক্ষা যুদ্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মুসলিমদের আবাসভূমি তথা ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ। মুসলিমদের আবাসভূমি বা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর যখন কোন শক্তি হামলা করে, তখন সে হামলা প্রতিহত করা প্রতিটি মুসলিমদের উপর ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্ঠিকভাবে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঐ আক্রমণ থেকে ইসলাম ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে কোন মুসলিমের অব্যহতি নেই। বরং তখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমের উপর সালাত সিয়ামের মতই ফরজে 'আইনে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থ বাদায়িউস্ সানায়েতে বলা হয়েছে,

"মুসলিমদের দেশের উপর শত্রুরা আক্রমণ করেছে, এ ঘোষণা যখন জারী করা হয়, তখন প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের উপর ব্যক্তিগতভাবে জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। সাধারণ ঘোষণা জারী হওয়ায় পর সকলে একত্রে জিহাদে অবর্তীণ হওয়া ব্যতীত এ ফরজ আদায় হয় না। এ সময় সালাত-সিয়ামের মতই প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরজে 'আইন হয়ে যায়। সুতরাং দাস মুনিবের এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বেড়িয়ে পড়বে। কেননা সালাত-সিয়ামের মত যে সকল 'ইবাদত প্রতিটি মুসলিমের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ, সেক্ষেত্রে দাসের উপর মনিবের এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর বৈধ কোন কর্তৃত্ব বা স্বত্ব নেই। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বেরিয়ে পড়া বৈধ। কারণ ফরজে 'আইনের

ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কোন কর্তৃত্ব চলে না, যেমন সালাত এবং সিয়ামের ক্ষেত্রে চলে না।"[11]

'জখিরা' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে 'নিহায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যখন জিহাদের ডাক আসবে, তখন যারা শত্রুর নিকটতম স্থানে অবস্থান করবে, তাদের উপর তা ফরজে 'আইন হবে। আর যারা শত্রু থেকে একটু দূরে অবস্থান করে, তাদের যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে সে জিহাদে তাদের অংশ গ্রহণ না করলেও চলবে। তবে নিকটবর্তী লোকেরা যদি শত্রুর মোকালিা করতে অক্ষম হয়, অথবা অলসতা ও উদাসীনতার কারণে মোকাবিলা না করায় তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে পাশ্ববর্তীদের উপর জিহাদ সালাত-সিয়ামের মতই ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে যাবে। এ দায়িত্ব থেকে তারা কোনভাবেই অব্যাহতি পাবে না। এভাবে প্রত্যেক পরবর্তী বসতির উপর দায়িত্ব বর্তাতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের উপর তা ফরজ হয়ে যাবে।"[12]

গ. দ্বীনের দা'ওয়াতকে বাধা মুক্ত করার এবং বিবেক-বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য জিহাদ

যে সমাজে ইসলাম কায়েম নেই, সে সমাজে দ্বীনের দা'ওয়াত দিতে গেলে দু'ধরনের বাধার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ যারা দা'ওয়াত দান করে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করে বা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে বাধা দেয়া হয়, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ না করে। ইসলাম দ্বীনের দা'ওয়াতকে অবারিত ও বাধাহীন করার এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনতভাবে ইসলাম গ্রহণের পথকে সুগম করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এজন্য যদি জিহাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে জিহাদও মুসলিমদের উপর আবশ্যক করা হয়েছে। ইসলাম মানুষকে স্বাধীনভাবে জীবন পথ নির্বাচনের সুযোগ দান করে এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য শক্তির অত্যাচার ও ভয়ভীতি থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য ঐ শক্তিসমূহের উচ্ছেদ সাধন করে, যাতে স্বাধীনভাবে ইসলামী আদর্শ গ্রহণের পথে বলপূর্বক বাধাদানকারী সকল শক্তি অপসারিত হয় এবং জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পায়।

নবী-রাসূল ও সাহাবা কিরামের আন্দোলন এবং যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইসলাম যখনই মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছে, তখনই অত্যাচারী ও অন্যায় প্রভূত্বের দাবীদারগণ এর বিরদ্ধে উন্মুক্ত তরবারী হাতে দাঁড়িয়েছে এবং এ আন্দোলকে কিছুতেই বরদাশত করতে রাজী হয়নি। কিন্তু এ সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে ইসলামের গতি কখনোই থেমে থাকেনি। বরং ইসলাম আল্লাহদ্রোহী শক্তির উচ্ছেদ সাধন ও দুনিয়ায় মানুষকে এ জালিমদের নির্যাতনমূলক শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের নির্দেশ দিয়েছে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এ সংগ্রাম অবিরাম গতিতে চলবে, যতদিন পর্যন্ত দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে না যায়। এ প্রসংগে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

---

১১. 'আলাউদ্দীন আবু বাকর ইবন মাস'উদ আল্ কাসানী, বাদায়িউস সানায়ি' ফি তারতিবিশ্ শারায়ি' (কোয়েটা, পাকিস্তান: মাকতাবায়ে রাশিদিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.) খ. ৭, পৃ. ৯৮।

১২. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্ জিহাদ, পৃ. ৬২। (শামী, খ. ৩, পৃ. ২৪০ এর উদ্ধৃতিতে)

ثم امره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله

"অত:পর আল্লাহ তাকে (নবীকে) মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন, যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"[13]

এরপর তিনি বলেন, "যখন সূরা তাওবা নাযিল হলো, তখন সেখানে আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ইসলামের দুশমন তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো, যতক্ষণ না জিযিয়া কর প্রদান করে অথবা ইসলাম গ্রহণ করে।"[১৪] ■ (চলবে)

১৩. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৮১।
১৪. প্রাগুক্ত।

ভগ্ন পরিবারের সন্তান

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

স্বামী- স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠে একটি স্বাভাবিক পরিবার। পরিবার দু'রকম হতে পারে, যথা : একান্নভুক্ত পরিবার ও যৌথ পরিবার। উভয় ধরনের পরিবারেরই সুবিধা-অসুবিধা দুটো দিক থাকতে পারে। এখানে আমরা সেসবের বিস্তৃত বিশ্লেষণে যাচ্ছি না।

বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো, পরিবারের সন্তান-সন্ততি। একটি দম্পতির সন্তানেরা প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক উভয় রকমই হতে পারে। একথা ঠিক যে, সন্তানেরা প্রাপ্ত বয়সে অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সে উপনীত হলে তারা নিজের ভালো-মন্দ অনেকটাই বুঝতে পারেন। তবে এরপরও তাদের ভুল করার বা বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব মৌলিকভাবে মাতা-পিতার ওপরই ন্যস্ত থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, যে পরিবারে মাতা-পিতা নেই, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের তত্ত্বাবধান কে করবেন। ওদের ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা দেখভাল, ওদের পরামর্শদান, বুদ্ধি-প্রদান, চিন্তা চেতনায় যুক্ত থাকাসহ ইত্যাকার কাজগুলো কার ওপর অর্পিত হবে।

একটি পরিবারে মাতা-পিতার অনুপস্থিতির কারণ ও ধরন নানা রূপ হতে পারে ঃ

ক. মাতা-পিতার বিয়ে-বিচ্ছেদ ;

খ. বিয়ে-বিচ্ছেদ পরবর্তী মাতা-পিতা উভয়ের বা তাঁদের কোন একজনের পুনর্বিয়ে ;

গ. মনোমালিন্যের কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক কাগজে-কলমে অক্ষুণ্ন থাকা সত্ত্বেও মাতা-পিতা কর্তৃক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন পরিবেশে ক্রমাগত অবস্থান (Separation) ;

ঘ. মাতা-পিতা– তাঁদের কেউ সংসারত্যাগী হওয়া বা নিরুদ্দেশ/ নিখোঁজ (address less) থাকা বা পরিবার তথা সংসারের সংশ্রব থেকে নানা কারণে একটানা দূরে অবস্থান করা ;

ঙ. মাতা-পিতার দীর্ঘ সময়ব্যাপী মানসিক অসুস্থতা বা কারাবরণ বা অকাল মৃত্যুবরণ ।

উপরোল্লিখিত ঘটনাসমূহ সংঘটনের ফলে স্বাভাবিক পরিবার ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে। কোনো কোনো ঘটনার কারণে পরিবার ভেঙ্গে যায়। জন্ম নেয় ভগ্ন পরিবারের। ভগ্ন পরিবার (Broken Family) একটি নিষ্ঠুর নিয়তিকে অনিবার্য করে তোলে। এর ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাতা-পিতার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা। ওরা মানসিক, আর্থিক, সামাজিক সকল দিক থেকে বহু মাত্রিক পীড়ন সর্বোপরি একটি ভয়াবহ নাজুক পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হয়। তারা কেবল তাঁদের মাতা-পিতাকেই হারায় না, একই সাথে হারায় তাঁদের সোনালি শৈশব, দুরন্ত কৈশোর এবং বাঁধভাঙা তারুণ্যের অমিত তেজ। অনাদর- অবহেলা- অযত্ন – অবজ্ঞা ইত্যাদির অভিশাপ তাদেরকে ক্রমশ ম্রিয়মাণ করে তোলে। মায়ের আদর, পিতার অপত্য স্নেহ –

এসবের অভাব ও বঞ্চনা তাদেরকে নিরন্তর কাঁদায় এবং কাঙাল বানায়। এক প্রকার হীনমন্যতা তাদেরকে অহর্নিশ গ্রাস করতে থাকে। অন্যায়-অব্যবস্থাপনার যাঁতাকালে তারা উপর্যুপরি নিষ্পেষিত হতে থাকে।

ভগ্ন পরিবার হওয়ার যে কারণটি প্রধান ও সর্বাধিক মর্মস্পর্শী ও স্পর্শকাতর তা হলো বিয়ে-বিচ্ছেদ। আর বিয়ে-বিচ্ছেদ হওয়ার কারণ যা-ই হোক না কেন এটি সন্তানের মানসপটে সর্বাধিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মাতৃহীন অবস্থায় যে ছেলেটি বা মেয়েটি মানসিক অপুষ্টতা নিয়ে বেড়ে ওঠে তার অন্তর্জালার পরিমাণ যতখানি তার চেয়েও বেশি পরিমাণ যন্ত্রণাদায়ক হলো যখন মা অথবা বাবা থেকেও থাকেন না। সন্তান জানে, তার 'বাবা' বা 'মা' জীবিত। তাঁকে/তাঁদেরকে সে অনুভব করে, অন্বেষণ করে। কিন্তু খুঁজে পায় না, পাশে পায় না। তিনি/তাঁরা থাকেন অন্য কোন সংসারে বা ভিন্ন কোন পরিবেশে।

<u>কেস স্টাডি</u> : ০১

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া দুরন্ত মেয়ে নীপা (ছদ্মনাম)। বয়স ১০। অনর্গল কথা বলে। হাসি-আনন্দ-হই-হুল্লোড় করে তার দিন কাটে। নীপার বন্ধু অনেক হলেও ওর প্রথম ও পরম বন্ধু হলো তার মা। এমন কোন কথা নেই-ঘটনা নেই যা সে মাকে জানায় না। খুঁনসুটিও সে মায়ের সাথেই করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নীপার মায়ের সাথে ওর বাবার দাম্পত্য সম্পর্কে ক্রমশ শীতলতা দেখা দেয়ার প্রেক্ষাপটে প্রায় বছর খানিকের মাঝে এক পর্যায়ে নীপার মা-বাবার বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটে। নীপার মা অগত্যা চলে যান নীপার নানা- বাড়িতে। নীপার বাবা তার এক বিধবা চাচাতো বড় বোনকে নিজ বাসায় নিয়ে আসেন। তিনিই এখন সংসার দেখেন। কিন্তু এ পরিবর্তনে ছন্দ পতন ঘটে নীপার ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবনে। স্কুল থেকে ঘরে ফিরে সে আর মাকে দেখতে পায় না। মায়ের সাথে হাসি-আহ্লাদও করতে পারে না। তার মুখের হাসি-উল্লাস ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। কথা বলার শক্তি ও গতিও একটু একটু করে কমতে থাকে। একসময় সে অনেকটাই যেন স্বল্পবাক হয়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে স্কুলে, বন্ধুমহলে। ক্রমান্বয়ে প্রাণোচ্ছল মিষ্টি মেয়েটি তার চিরাচরিত চাঞ্চল্য ও উদ্দামতা হারিয়ে ফেলে। স্কুলে তার রেজাল্টও খারাপ হতে থাকে। দেখা দেয় বিষণ্নতা। ডাক্তার কোন সুনির্দিষ্ট রোগ খুঁজে পান না। এক সময়ে তার স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে তার মাঝে কিছু মানসিক সমস্যাও দেখা দিতে শুরু করে। মনের গহীনে দু:খবোধে ক্ষয়িষ্ণু নীপা দিনে দিনে বদলে যায়। হারিয়ে ফেলে তার শ্বাশত ও মুখরিত বর্ণিল জীবন।

<u>কেস স্টাডি</u> : ০২

মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়ার একটি বাসা থেকে পুলিশ গত সোমবার রাতে সায়েম দেওয়ান (১৫) নামে এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্র জানায়, সায়েম তার দাদা-দাদির সঙ্গে ৭৬০ পশ্চিম কাজীপাড়ায় থাকত। চলতি মাসের ১ তারিখে তারা টিনশেড বাড়িটির একটি কক্ষ ভাড়া নেয়। সায়েমের দুই বছর বয়সে তার মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বাবা বছর দুয়েক আগে আবার বিয়ে

করেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সায়েম দাদা-দাদি, বাবা ও সৎ মায়ের সঙ্গে একটি পাকা বাড়িতে ভাড়া থাকত। সম্প্রতি সায়েমের বাবা বাবু দেওয়ান সায়েম ও তার দাদা-দাদিকে আলাদা বাসা ভাড়া করে দেন। সায়েমের নিজের মা পাঁচ-ছয় বছর ধরে মরিশাসে থাকেন। তবে সায়েমের বাবা ও দাদা পশ্চিম কাজীপাড়ায় চায়ের দোকান চালান। এর পাশেই সায়েম গ্যাস লাইটার বিক্রি করত।

মিরপুর থানার পুলিশ ও প্রতিবেশীরা জানান, সোমবার সকালে সায়েমের দাদি এক আত্মীয়ের বাসায় যান। দাদা জালাল দেওয়ান চলে যান দোকানে। দুপুরে সায়েমের এক আত্মীয় বাসায় এসে দরজা লাগানো দেখে ফিরে যান। তিনি আবার রাত নয়টার পর আসেন এবং সায়েমের দাদি কে ডাকতে থাকেন। সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি দরজায় ধাক্কা দেন। দরজা খুললে দেখতে পান সায়েম সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় ঝুলছে . . .। (সূত্র ঃ প্রথম আলো, ১১.১০.২০১৭)

এগুলো সত্য ঘটনা। এরূপ উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি।

এভাবেই বিয়ে-বিচ্ছেদ বা বিচ্ছেদ পরবর্তী পুনর্বিয়ের ফলে মাতা-পিতা উভয়ই জয়ী হন – উভয়েরই ক্ষণিকের জেদ মেটে, কেবল হেরে যায় তাঁদের অসহায় সন্তানেরা।

বলা বাহুল্য, বিয়ে-বিচ্ছেদের মাধ্যমে ভগ্ন পরিবারের সন্তানগণ সর্বাধিক যে ক্ষতিটির শিকার হয় তা হলো মানসিক ক্ষতি বা মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি। এ ক্ষতির তীব্রতা ও মাত্রা ভয়াবহ হয়, ক্ষতিও সুদূরপ্রসারী হয় ।

এ জাতীয় ক্ষতির মৌলিক দিকগুলো হলো–

১. ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় ;

২. মনের মাঝে এক প্রকার অনুচিত হীনম্মন্যতা বাসা বাঁধে;

৩. কথা ও আচরণে অস্পষ্টতা ও জড়তা ভাব সৃষ্টি হয়;

৪. স্বাধীন চিন্তা–চেতনা শক্তি লোপ পায়;

৫. আত্মবিশ্বাসের (Self-confidence) ঘাটতি দেখা দেয় ;

৬. আত্মশক্তি ও মনোবল ক্রমশ কমতে থাকে ;

৭. স্বাভাবিক সামাজিকতা থেকে আড়াল হয়ে পড়ে ;

৮. বেশি মাত্রায় জেদী, উগ্র, বেপরোয়া বা নেশাগ্রস্ত বা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে ;

৯. স্বাভাবিক পরিবার-পরিমন্ডলের অভাবহেতু অনেক জীবন–জিজ্ঞাসার জবাব ও রকমারি অভিজ্ঞতা অজানা থেকে যায়;

১০. মন ও মননে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠা অনেকটা দুরূহ হয়ে পড়ে।

সুতরাং, ভগ্ন পরিবারের সন্তানদের দুর্দশা মোচন করতে হলে সবার আগে দরকার পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখা এবং পরিবারের প্রতি নিবেদিত হওয়া, এক কথায় পরিবারমনস্ক হওয়া।

> ভগ্ন পরিবার হওয়ার যে কারণটি প্রধান ও সর্বাধিক মর্মস্পর্শী ও স্পর্শকাতর তা হলো বিয়ে–বিচ্ছেদ। আর বিয়ে-বিচ্ছেদ হওয়ার কারণ যা–ই হোক না কেন এটি সন্তানের মানসপটে সর্বাধিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মাতৃহীন অবস্থায় যে ছেলেটি বা মেয়েটি মানসিক অপুষ্টতা নিয়ে বেড়ে ওঠে তার অন্তর্জালার পরিমাণ যতখানি তার চেয়েও বেশি পরিমাণ যন্ত্রণাদায়ক হলো যখন মা অথবা বাবা থেকেও থাকেন না। সন্তান জানে, তার 'বাবা' বা 'মা' জীবিত। তাঁকে/তাঁদেরকে সে অনুভব করে, অন্বেষণ করে। কিন্তু খুঁজে পায় না, পাশে পায় না।

একটি পরিবার তখনই সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে, যখন পরিবারের সদস্যগণ ভালো থাকেন। এ 'ভালো থাকা' বলতে বুঝায় মূলত মনমানসিকতার দিক থেকে ভালো ও নিষ্কলুষ থাকা। নিছক ক্ষুধা-অভাবমুক্ত ধনী পরিবারকেই সুস্থ-ভালো পরিবার বলা যায় না। যদি না ঐ পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বন্ধন অটুট ও শান্তিপূর্ণ হয়। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন তখনই মজবুত, নিবিড় ও প্রশান্তিময় হবে যখন তাঁদের মাঝে সম্পর্কটি প্রেমময়, সৌহার্দ্যপূর্ণ, বিশ্বস্ত, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধসম্পন্ন ও মানবিক হবে। এর অভাবে পরিবারে শান্তি আসতে পারে না। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একে অপরের প্রতি কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পরিহার করতে হবে। নিজেকে স্বামী না ভেবে সেবক ও দায়িত্বশীল ভাবতে হবে। কোন কিছুই কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া সমীচীন নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সবকিছুই করতে হবে যথাসম্ভব পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। নির্ভেজাল আন্তরিকতার আবরণে মনের মাধুরি মিশিয়ে অন্তরের সুরভি ছড়িয়ে একটি প্রেমময় ফলগুধারার ভিত কায়েম করতে পারলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সহসা চির ধরবে না। বিয়ে-বিচ্ছেদ এর সম্ভাবনা থাকবে না। পরিবার ভাঙবে না। সন্তানদেরও পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।। ■

ইউক্রেন যুদ্ধ

মীযানুল করীম

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ১০০০ দিন পূর্ণ হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর পর গত ১৯ নভেম্বর হাজার তম দিনে পদার্পণ করল এই যুদ্ধ। দীর্ঘ সময় পর হলেও এখনো কার্যত যুদ্ধ বন্ধের কোন দৃশ্যমান পরিস্থিতি দেখা যায়নি। রাশিয়ার ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা করার অনুমতি দেওয়ায় নতুন মাত্রায় দুই দেশের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে প্রথমবারের মতো রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন।

কিয়েভের হামলার আগেই ইউক্রেনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ফলে সামনের দিনগুলোতে এই যুদ্ধের গতি-প্রকৃতিতে বদল আসতে পারে বলে মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। প্রায় তিন বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধে ইউক্রেনের হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গেছে। লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পার্শ্ববর্তী পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই ইউরোপের সবচেয়ে বড় সংঘাত। এর ফলে সামরিক দিক থেকে কার কত ক্ষতি হয়েছে তা গোপন রেখেছে উভয় পক্ষই। গোয়েন্দাদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমা দেশগুলো যে হিসাব করেছে, তাতে এক দেশের হিসাবের সঙ্গে অন্য দেশের হিসাবের প্রচুর ফারাক রয়েছে। তাতে সব রিপোর্টই বলছে, দুই পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রচুর মানুষ হতাহত হয়েছে। এখনো দুই পক্ষ একে অন্যকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে আবার প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে আসার পর যুদ্ধে ওয়াশিংটনের নীতিতে পরিবর্তন আনবেন সেটা অনেকটা নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ট্রাম্পের নীতিতে পরিবর্তন আনলেও ৩৩ মাস ধরে চলা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির খুব একটা বদল হবে না। তবে ট্রাম্প অচিরেই এই যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন আগেই। বাইডেনের সিদ্ধান্তের পর যুদ্ধে পুতিনের পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি যুদ্ধে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যুদ্ধের এক হাজার তম দিনে পুতিন এ সংক্রান্ত একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন। রুশ প্রেসিডেন্ট কার্যালয় ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রী পেসকভ জানিয়েছেন, নতুন এই ডিক্রির মাধ্যমে যেসব দেশের পরমাণু অস্ত্র নেই তাদের যদি তৃতীয় কোন দেশ বা পক্ষ এ ধরনের বিধ্বংসী অস্ত্র প্রদান করে, সে ক্ষেত্রে সেসব দেশের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে রাশিয়া। পেসকভ বলেন, রাশিয়া সবসময় পরমাণু

অস্ত্র ব্যবহার করার বিপক্ষে। আমরা শুধু আমাদের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা রক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দুই দেশের মধ্যে কোনরকম আলোচনা হয়নি। সম্ভাব্য আলোচনার আগে দুই দেশই তাদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে চাইতে পারে। ইউক্রেন ও রাশিয়া চাইবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের আরো কিছুটা জমি দখল করে নিয়ে আলোচনায় বসতে। আর সেই দরকষাকষিতে যুক্তরাষ্ট্র শেষ সময়ে রুশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে হামলা চালানোর অনুমতি দিয়েছে ইউক্রেনকে। যুক্তরাষ্ট্র এই অনুমতি দিয়েছে নিজেরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার জন্যই। ইউক্রেন আগস্ট থেকে রাশিয়ার কুরস্কের একটা অংশ দখল করে রেখেছে। সেখানে তারা সবচেয়ে দক্ষ সেনা পাঠিয়েছে। ইউক্রেনের দাবি রাশিয়া সেখানে ৫০ হাজার সেনা পাঠিয়েছে। তাছাড়া তারা পূর্ব ইউক্রেনেও দ্রুত কিছু এলাকা দখলে অগ্রসর হচ্ছে রুশ বাহিনী।

তবে আসন্ন শীত মৌসুমে ইউক্রেন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। রাশিয়ার হামলায় দেশটির বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। গত দুই বছরে ইউক্রেনে অর্থনীতি মাঝারি আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও যুদ্ধের আগের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে ইউক্রেনের অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে ইস্পাত শিল্প ও কৃষিক্ষেত্র।

জটিল হচ্ছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। যুদ্ধটা রাশিয়া ও ইউক্রেনের হলেও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন দেশ। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে বৈশ্বিক এক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেছেন, দরকার হলে পশ্চিমা দেশগুলোতে হামলা চালাতে পিছপা হবে না তিনি।

পুতিন এ হুঁশিয়ারি তখন দিলেন, যখন ইউক্রেনের নিপ্রো এলাকায় নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। প্রথমে একে আন্তমহাদেশীয় ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) মনে করা হলেও পরে মস্কো জানিয়েছে সেটি নতুন প্রজন্মের হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছিল। এই ক্ষেপণাস্ত্রও আইসিবিএম এর মত পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে পারে বলে জানিয়েছেন পুতিন।

৩৩ মাসের অধিক সময়ের এই যুদ্ধে বিপুল সামরিক সহায়তা দিয়ে ইউক্রেনকে টিকিয়ে রেখেছে পাশ্চাত্য মিত্ররা। ইউক্রেনে হামলা করার আগের দুই দিন মার্কিন এবং ব্রিটিশ মিশাইল ছুঁড়েছে সে। এবার নিপ্রোতে রাশিয়া তার জবাব দিয়েছে। এতে ইউক্রেনের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। ব্রিটিশ ও মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলো হামলা করার আগেই আকাশে ধ্বংস করে দিয়েছে বলে রাশিয়া দাবী করেছে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন, শত্রুর লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। যারা রাশিয়ার উপর হামলা চালাতে অনুমতি দিয়েছে, সেসব দেশের উপর রাশিয়া হামলা করতে পারে। এবারে ছোঁড়া একটা মিসাইল-এর নাম 'ওরেশনিক' বা এটি মধ্যপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, যা শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে পারে। আমেরিকা সহ পাশ্চাত্যের ন্যাটো জোট বলেছে, এটি শব্দের চেয়ে জোরে চলতে পারে না তবে সাড়ে ৫ হাজার কিলোমিটার দূরের টার্গেটে আঘাত হানতে সক্ষম।

শীতের প্রাক্কালে ইউক্রেনে ব্যাপক মিশাইলের ড্রোন হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। তারা সুমি শহরে হামলা করলেও দোনেৎস্ক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম দখল করে নিয়েছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন ওরেশনিক মিশাইল আটকানো যায় না। ইউক্রেনের নিম্ন অঞ্চলে মিশাইল ছুঁড়েছে রাশিয়া। দরকার বোধে রাশিয়া পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারে। এজন্য সে নতুন ও শক্তিশালী মিশাইল মজবুত করেছে এবং এগুলো ব্যবহারে সম্পূর্ণ তৈরি আছে বলে জানিয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট টিভি ভাষণে আরো বলেন, "ওরেশনিক মিশাইল হচ্ছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এরপর আরো পরীক্ষা চালানো হবে।"

সব মিলিয়ে ইউক্রেনে উত্তেজনা বেড়েছে। প্রথমবারের মতো মার্কিন ও ব্রিটিশ দূরপাল্লার মিশাইল দিয়ে ইউক্রেনে হামলা করেছে। রাশিয়াকে তার বাস্তব পরিণতি ভোগ করার জন্য এবং বিশ্ব নেতাদের গুরুতর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য ইউক্রেন আহ্বান জানিয়েছে। ইউক্রেনে আরো আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠাতে পাশ্চাত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন। দাবি করেছে মার্কিন থাড মিশাইল অথবা প্যাট্রিয়ট পাঠাতে বলেছে। থাড মানে টার্মিনাল হাই অ্যালাটিটিউড এরিয়া ডিফেন্স।

ওরেশনিক মিশাইল শব্দের চেয়ে দশ গুণ বেশি গতিতে উড়ে যায়। রাশিয়া এ মিশাইল উৎপাদন বাড়াতে বলেছে। নভেম্বর মাসে ইউক্রেনের হামলার পরিণতি নিয়ে রাশিয়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এবং ওরেশনিক মিশাইল ব্যবহারের হুমকি দেয়।

ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে আরো অগ্রসর হওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া। সেখানে একটি গ্রাম নাকি দখল করেছে সে। এদিকে উত্তর কোরিয়ার ১০ হাজার সৈন্য রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধে নামবে। পেন্টাগণ প্রধান বলেছেন, রাশিয়ার কুরস্কে তারা লড়াই করবে। দক্ষিণ কোরিয়ার দাবি, তেল, আকাশ ও অর্থনৈতিক সহায়তার বিনিময়ে মস্কো এই সেনা সহায়তা নিয়েছে।

পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর মুখপাত্র ফারাহ দাখলাল্লাহ বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার নতুন ধরনের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে সংঘাতের ধরন বদলাবে না কিংবা কিয়েভকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া থেকে নেটোও পিছু হাঁটবেনা। তিনি বলেন, রাশিয়া মধ্যবর্তী পাল্লার ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিক এবং ইউক্রেনের মিত্রদের ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, রাশিয়ার এ অস্ত্র মোতায়েনের সক্ষমতায় সংঘাতের স্বরূপও বদলাবে না, আর ন্যাটো মিত্ররাও ইউক্রেনকে সমর্থন করা থেকে নিবৃত হবে না। ইউক্রেন রাশিয়ার অভ্যন্তরে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র এটিএসিএমএস ও ব্রিটিশ স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

রাশিয়া এ অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। ইউক্রেন তা অগ্রাহ্য করে এ হামলা চালায়। এরপরই রাশিয়া ইউক্রেনে নতুন এক ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। টিভিতে প্রচারিত আকস্মিক এক ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, '২১ নভেম্বর রাশিয়ার ভূখন্ডে ইউক্রেনের আমেরিকান ও ব্রিটিশ অস্ত্র হামলার জবাবে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যবর্তী পাল্লার (ইন্টারমিডিয়েটের রেঞ্জ) এক নতুন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ইউক্রেনে আঘাত এনেছে।' এ ক্ষেপণাস্ত্রটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের অ-পারমাণবিক

হাইপারসনিক সংরক্ষণ ছিল জানিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যে সব দেশ ইউক্রেনকে রাশিয়ার গভীরে তাদের অস্ত্র হামলার অনুমতি দিয়েছে সেসব দেশেও এই ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে পারে মস্কো।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পাল্টা হামলার হুমকি দিলেও পারমাণবিক হামলার তেমন আশঙ্কা নেই বলেই দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সংশ্লিষ্ট ৫ কর্মকর্তা।

তবে দুই উর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলোর উপর চাপ বাড়াতে ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিশানা করে নাশকতা অভিযান বাড়াতে পারে রাশিয়া। গত সাত মাসে একাধিক গোয়েন্দা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ইউক্রেনের উপর থেকে মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারে বিধিনিষেধ শিথিলের যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের ফলে পারমাণবিক উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন সম্প্রতি ইউক্রেনকে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ায় হামলা চালানোর যে অনুমতি দিয়েছে তারপরও রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়নি। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন হুমকি দিলেও পাল্টা পারমাণবিক হামলার আশঙ্কা নেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার দাবি।

মার্কিন কংগ্রেসের এক কর্মী গোয়েন্দা ব্রিফিংয়ে বলেছেন, এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের ফলেই রাশিয়ার পারমাণবিক নীতিতে বদল আসবেনা। রাশিয়া ইউক্রেনে নতুন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। বিশ্লেষকরা বলেছেন ওয়াশিংটন ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের জন্য এই ছিল সর্তকতা। আগে যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া রাশিয়া দেখায়নি।

ইউক্রেন-এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার অধিকার রাশিয়ার রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে তিনি বলেছেন, ইউক্রেনের দূরপাল্লার অস্ত্রের ব্যবহার যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের ফল এবং মস্কোর লড়াই করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে সিএনএ বলেছে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোসভের সাথে দেখা করেছেন কিম।

তিনি বলেছেন, 'কিয়েভ কর্তৃপক্ষকে মার্কিন তৈরি দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে রুশ ভূখন্ডে আক্রমণে বাধ্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা এবং রাশিয়ার উচিত শত্রু শক্তিকে মূল্য চুকাতে পদক্ষেপ নেয়া। কিমের বরাতে বার্তা সংস্থাটি জানায়, ডিপিআরকে সরকার, সেনাবাহিনী ও জনগণ সর্বদা রুশ ফেডারেশনের নীতি সমর্থন করবে সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতাকে আধিপত্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে।'

উত্তর কোরিয়ার সরকারি নাম ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া। সংক্ষেপে ডিপিআর বলা হয়। কেসিএনএ জানিয়েছে, জুনে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে কিম যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্বাক্ষর করেছিলেন সেটির অধীনে সব ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তিও রয়েছে। মস্কো ও পিয়ং ইয়ং গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাশিয়ায় তাদের নেতাদের শীর্ষ বৈঠকের পর থেকে

নাটকীয়ভাবে সম্পর্কের উন্নত করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার তথ্য অনুসারে উত্তর কোরিয়া ১০ হাজারেরও বেশি কন্টেইনার গোলাবারুদ, একই সাথে স্ব-চালিত হাউইউজার ও একাধিক রকেট লাঞ্চার পাঠিয়েছে। কিম ও বেলোসভ রাশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার সেনা মোতায়েনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিনা সে বিষয়ে উল্লেখ করেননি কেসিএনএ। দক্ষিণ কোরিয়ার গুপ্তচর সংস্থা বলেছে, উত্তর কোরিয়া রাশিয়ায় ১০ হাজারের বেশি সেনা পাঠিয়েছে ও তাদের কুরস্ক অঞ্চলসহ ফ্রন্টলাইনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে রুশ বাহিনী ইউক্রেনীয় বাহিনীকে পিছু হটানোর চেষ্টা করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন চলতি মাসে এই ধরনের হামলার জন্য ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডে আঘাত করতে মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এরপরেই রাশিয়ায় এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

ইউক্রেনের অবকাঠামোর উপর হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। দেশটি বলছে, এটি মার্কিন মাঝারিপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ছিল। উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নো কোয়াং চোলের সাথে আলোচনা করেছেন বেলোসভ। তিনি বলেছেন, কিম ও পুতিনের স্বাক্ষরিত অংশীদারিত্ব চুক্তি উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে অবদান রাখবে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের বিশ্লেষক ক্রিস্টোফার গ্রীন বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার উপর ঐতিহাসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে চীনের। দেশটির সঙ্গে পিয়ং ইয়ং ও রাশিয়া উভয়েরই সীমান্ত রয়েছে। তবে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সাম্প্রতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়টি চীনের নিয়ন্ত্রণ কমাতে পারে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং যদি নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষায় দ্রুত কোন পদক্ষেপ না নেন তাহলে সেটি বেইজিং এর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা ক্ষমতাদর দেশগুলোর সঙ্গে টানা পড়েন চলছে চীনের। এমন অবস্থায় উত্তর কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার হাতে চলে গেলে তা অনেকটা মড়ার উপর খাড়ার ঘা হয়ে উঠবে এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশটির জন্য।

উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে চীনের। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দেশটির পুনর্গঠনে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে চীন। বেইজিংয়ের সহায়তা ছাড়া উত্তর কোরিয়ার টিকে থাকাটা বেশ কঠিন। কেননা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগই চীনের সঙ্গে করতে হয় পিয়ং ইয়ং কে। এমনকি জ্বালানি ও খাদ্যের মতো বিষয়গুলোতে চিনির উপর নির্ভরশীল কিম জং উনের দেশ। ফলে চীন বিষয়টিকে নিজেদের পর্যবেক্ষণের ভেতর রাখছে বলে জানান আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক গ্রীন। তিনি বলেছেন, চীন এখনই কোন পদক্ষেপ না নিলেও তারা বিষয়টি নিবিড় ভাবে দেখছে। চীন এশিয়াসহ বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য বাড়াতে যা যা করার প্রয়োজন তা করতে পিছপা হবে না।

২০২২ সালে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরুর পর ঝুঁকির মাত্রা কখনোই এত বেশি ছিল না। যুদ্ধের এক হাজার দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এটি ছিল মূলত যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনের সপ্তাহ। এ সময় পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তায় ইউক্রেনের সামরিক শক্তি বেড়েছে বহুগুণ। অন্যদিকে পারমাণবিক হামলার হুমকি দিয়েছে রাশিয়া। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গত এক সপ্তাহে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।

ইউক্রেনকে পশ্চিমাদের সমর্থন :

রুশ ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি দূরপাল্লার এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আঘাত হানতে ইউক্রেনকে অনুমতি দেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অনুমোদনের খবর প্রকাশের পরপরই রাশিয়ার ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় ইউক্রেন। এটা ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র প্রথমবারের মতো রুশ ভূখণ্ডে আঘাত এনেছে।

রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে ব্রিটিশ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় ইউক্রেন। এরপর মানববিধ্বংসী লেন্ডমাইন ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়ে ইউক্রেনের সামরিক শক্তি আরো বেড়ে যায়। এক সপ্তাহে এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পশ্চিমারা ইউক্রেনের প্রতি তাদের সমর্থন অটুট থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে।

পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি :

রাশিয়ার পরমাণুনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ফলে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা কয়েকগুণ বেড়েছে বলে মত বিশ্লেষকদের। এরপর ইউক্রেনের দিনিপ্রো শহরে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রাশিয়া। পুতিনের দাবি, এই ক্ষেপণাস্ত্রের গতি শব্দের চেয়ে দশ গুণ বেশি এবং এই অস্ত্রকে প্রতিহত করার কোন উপায় নেই।

বেশিরভাগ পর্যবেক্ষক বলছেন, এই হামলার মাধ্যমে রাশিয়া সর্তকতা বার্তা দিয়েছেন যে, মস্কো চাইলে এই ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনে পারমাণবিক হামলা চালাতে পারে।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর পারমাণবিক হামলার লাল রেখা চিহ্নিত করে দিয়েছেন পুতিন। তবে বরাবরই সেই রেখা অতিক্রম করেছে পশ্চিমারা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমারা কেন রাশিয়ার পারমাণবিক হামলার হুমকি নিয়ে জুয়া খেলতে প্রস্তুত? এর কারণ চীন। রাশিয়ার উপর যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রভাব কমিয়ে আনতে মস্কোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠেছে চীন।

পশ্চিমাদের ধারণা, পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখাবে চীন। এ কারণে পুতিন পারমাণবিক হামলা চালাতে নিরুৎসাহিত হবেন।

বৈশ্বিক সংঘাত :

জটিল হচ্ছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। যুদ্ধটা রাশিয়া ও ইউক্রেনের হলেও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন দেশ। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে বৈশ্বিক এক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেছেন, দরকার হলে পশ্চিমা দেশগুলোতে হামলা চালাতে পিছপা হবে না তিনি।

পুতিন হুমকি দেন, বৈশ্বিক সংঘাতে পরিণত হওয়ার সব ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে এই যুদ্ধের।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এই যুদ্ধে আগের চেয়েও বেশি জড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে রুশ বাহিনীর সঙ্গে উত্তর কোরিয়া সেনাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আরো একটি পারমাণবিক শক্তিদর দেশ ইউক্রেন যুদ্ধে সম্পৃক্ত হলো। উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উন বলেন, পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি।

বাইডেনের বিদায়, ট্রাম্পের আগমন :

যুদ্ধের চলমান পরিস্থিতির সম্ভাব্য কারণ হলো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বলে এসেছেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করবেন। তার রানিং ম্যাটের বক্তব্য থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে, ইউক্রেনকে আপস করতে হবে। সম্ভবত ক্রিমিয়া ও ডনবাস অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া লাগতে পারে। আর এই পদক্ষেপ বিদায়ী বাইডেন প্রশাসনের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণে আগামী জানুয়ারিতে ট্রাম্প শপথ নেওয়ার আগেই ইউক্রেনকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করে যেতে চাইছেন বাইডেন।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচাইতে ভয়ানক। এতে একটি পরাশক্তি এবং অপরদিকে পুরো পাশ্চাত্য ইউক্রেনকে সহযোগিতা করছে। তাই এ যুদ্ধ কখন থামে ঠিক নেই। সম্প্রতি এক সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়েছে এবং যুদ্ধটি অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে উঠেছে। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : মুসল্লী সবাই যদি নারী ও শিশু হয়, প্রাপ্তবয়স্ক কোনো পুরুষ না থাকে তখন তারা কিভাবে সালাত আদায় করবেন?

শামীম হোসাইন, ইচলী, চাঁদপুর।

উত্তর : ইমামত করার মত প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো পুরুষ যদি না থাকে তাহলে শিশুদের মধ্য থেকে যার সালাতের মাসআলা-মাসায়িল বেশি জানা আছে এবং কিরা'আতও বেশি শুদ্ধ আছে সে ইমামাত করবে। তার ইমামাতে সবাই জামা'আতে সালাত আদায় করবে। ইমাম সবার সামনে দাঁড়াবেন। তার পিছনের কাতারে দাঁড়াবে পুরুষ (শিশুরা)। তাদের পিছনের কাতারে দাঁড়াবেন নারীগণ। এভাবে তিন কাতারে দাঁড়াতে হবে।

প্রশ্ন-২ : ফরজ সালাত আদায় করার জন্য তিনজন মুসল্লী একত্র হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন নারী ও দু'জন পুরুষ এবং সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। তারা কিভাবে জামা'আতে সালাত আদায় করবেন?

উত্তর: একজন পুরুষ ইমামত করবেন, পুরুষ অপরজন ইমামের ডান পাশে ইমামের চাইতে কিছুটা পিছিয়ে দাঁড়াবেন। আর মহিলা তাদের পিছনে পিছনের কাতারে দাঁড়াবেন।

প্রশ্ন-৩ ঃ উযূ করার পর যদি পেশাবের ফোটা আসে (এক বা একাধিক), কিংবা ফরয গোসল করার পর যদি মনির ফোটা আসে (এক বা একাধিক), এমতাবস্থায় করণীয় কি?

সালাউদ্দিন, নোয়াখালী

উত্তর ঃ প্রশ্নে দু'টি মাসআলা জানতে চাওয়া হয়েছে। একটি উযুর মাসআলা, অপরটি গোসলের মাসআলা। আমরা প্রথমে উযুর মাসআলা আলোচনা করবো।

উযু বা গোসলের আগে পেশাব পায়খানার বেগ থাকলে বিশেষ করে সালাত আদায়কারী মুসাল্লিয়ানে কেরাম পেশাব-পায়খান সেরেই উযূ ও গোসল করবেন। অনেকেই বা কেউ কেউ জানতে চায়, উযূ করার পর যদি (এক বা একাধিক ফোটা) পেশাব বের হয়ে আসে তখনকার মাস'আলা কি হবে? এর সোজা জবাব হলো পেশাব যদি এক ফোটাও বের হয়ে আসে তাহলে তাতে উযূ ভেঙ্গে যবে বা নষ্ট হয়ে যাবে। তখন সালাত আদায়, কা'বা ঘর তাওয়াফ কিংবা কুরআন মাজীদ স্পর্শ করে তিলাওয়াত করতে চাইলে অবশ্যই নতুন করে উযূ করতে হবে। উযূ না করে এর কোনোটাই করা জায়েয হবেনা, বরং কবিরা (বড়) গুনাহ হবে।

মা'যূরের মাস'আলা :

কেউ যদি অনবরত পেশাব ঝরার অথবা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা পূজ পড়ার অথবা অনুরূপ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, অত:পর সে (কোনো এক ওয়াকতের) সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে ওয়াকতের শুরু থেকে উযূ করে সালাত আদায়ের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু উপরিউক্ত রোগের কারণে বার বার উযূ করেও উযূ অবস্থায় সালাত আদায় করার কোনো সুযোগ পাচ্ছে না বরং যতবারই উযূ করছে উক্ত রোগের কারণে উযূ ভেঙ্গে যাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি সালাতের পুরো ওয়াকত অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ঐ ব্যক্তি শরী'আতের বিধান অনুযায়ী

মা'যূর হিসেবে গণ্য হবে। তখন থেকে এই ব্যক্তির এই রোগ এই অবস্থায় যতদিন চলমান থাকবে, এমনকি কোনো ওয়াকতে একবার হলেও সে মা'যূর হিসেবে গণ্য থাকবে।

মা'যূরের মাস'আলা হলো-

যেমন ধরা যাক, যোহরের ওয়াকতে সে যোহরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উযূ করলো, উযূ ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ না ঘটে থাকলে[১৫] উযূ করার পর থেকে যোহরের শেষ ওয়াকত পর্যন্ত তার এই উযূ থেকে যাবে। এই উযূতেই সে সালাত আদায় (ফরয, সুন্নাত, নফল যা ইচ্ছা) কুরআন স্পর্শ করে তিলাওয়াত ও কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে। যোহরের ওয়াকত শেষ হলে তার উযূর মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উযূ ভেঙ্গে যাবে। (দেখুন- আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : খ : ১, পৃ. ২৮৮-২৯০)

এই ধরনের রোগীদের সালাত আদায়ের জন্য সালাতের প্রত্যেক ওয়াকতেই নতুনভাবে উযূ করতে হবে।

হাদীসে এসেছে, স্রাব জনিত রোগী (অর্থাৎ অনিয়মিত মাসিকের রোগী) সালাতের প্রত্যেক ওয়াকতের জন্য নতুনভাবে উযূ করবে। (প্রাগুক্ত)

এ জাতীয় অন্যান্য রোগের বেলায়ও একই মাস'আলা প্রযোজ্য। অর্থাৎ মা'যূর ব্যক্তিদের ওয়াকতের সালাত আদায়ের জন্য নতুনভাবে উযূ করতে হবে এবং ওয়াকত শেষ হলে উযূ ভেঙ্গে যাবে।

কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেছেন :

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ

(যারা সম্পূর্ণ পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করবেনা।[১৬]

হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবন হাযমের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন,

'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেনো কুরআন স্পর্শ না করে।'[১৭]

প্রশ্ন-৪ ঃ আমাদের ঘরবাড়ি পাকা নয় বরং মাটির ঘর। ঘরের ফ্লোর মাটির। কখনো কখনো মাটির ফ্লোরে ছোট শিশুরা পেশাব করে। ফলে ফ্লোরে নামায পড়তে সংকোচ ও সন্দেহ হয় যে, এ ফ্লোরে নামায পড়লে নামায হবে কিনা? এ ব্যাপারে সঠিক মতামত জানতে চাই।

হাসানুজ্জামান

ময়নামতি, কুমিল্লা,

উত্তর ঃ মাটির ফ্লোরে বা মাটির ঘরের মেঝেতে বাচ্চারা পেশাব করলে পেশাব শুকিয়ে গেলে তা পাক ও পবিত্র হয়ে যায়। তাতে সালাত আদায় করতে কোন বাধা থাকে না এবং এতে সন্দেহের কিছুই নেই। নিঃসংকোচে সেখানে সালাত আদায় করা যায়। তাছাড়া সালাত তো

১৫. সংশ্লিষ্ট রোগ ছাড়া উযূ ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ ঘটে থাকলে তাতে অবশ্যই উযূ ভেঙ্গে যাবে।
১৬. সূরা আল ওয়াকি'আহ : ৭৯।
১৭. মুয়াত্তা মালেক ১ম খ. পৃ. ২৯৯।

কেউ খালি মেঝেতে পড়ে না বরং জায়নামায বিছিয়ে তার উপর সালাত আদায় করা হয়। শিশুদের পেশাব শুকিয়ে যাওয়ার পর সেই মেঝেতে সালাত আদায় করাতে কোন বাধা নেই এবং সন্দেহের কিছুই নেই।

প্রশ্ন-৫ ঃ আমাদের গ্রামের মসজিদ বাড়ি থেকে অনেক দূরে। বাড়িতে আর কোন পুরুষ লোক নেই। আছেন মা, স্ত্রী ও তিন মেয়ে। আমি বাড়িতে একা একা সালাত আদায় করি। আমি কি মা, স্ত্রী ও মেয়েদেরকে নিয়ে জামাতে সালাত আদায় করতে পারি?

আব্দুর কুদ্দস, রাঙ্গামাটি

উত্তর ঃ মাসজিদ দূরে হলেও এবং সব সময় সম্ভব না হলেও যখনই সম্ভব হয় এবং সময় ও সুযোগ থাকে মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করার চেষ্টা করবেন। যখন মাসজিদে যাওয়া সম্ভব না হয় তখন বাড়িতেই মা, স্ত্রী এবং মেয়েদেরকে নিয়েই জামা'আতে সালাত আদায় করবেন। এতে তাদেরও জামা'আতে সালাত আদায় করা হবে এবং আপনারও। আপনি ইমাম হবেন মা, স্ত্রী এবং মেয়েরা মুক্তাদি হবেন। আপনি সামনে দাঁড়াবেন আর মা, স্ত্রী ও মেয়েরা পিছনের কাতারে দাঁড়াবেন।

প্রশ্ন-৬ ঃ আমার নানার দুই ছেলে। আমার জন্মের পর আমার মা মারা যান। আমি নানীর দুধ পান করি। সেই হিসেবে নানি আমার দুধ মা এবং নানা আমার দুধ পিতা। দুধ মা ও দুধ পিতা হিসেবে আমি কি নানা-নানীর সম্পদের ওয়ারিশ হবো ?

আশরাফুল ইসলাম
বিবিরহাট, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ দুধ পান সম্পর্কের সূত্রে দুধ মা ও দুধ পিতার সম্পদের ওয়ারিশ হয় না। অতএব আপনি আপনার নানা-নানীর সম্পদের ওয়ারিশ হবেন না। আপনার নানা-নানির দুই ছেলে ছাড়া আর কোন সন্তান এবং তাদের পিতা-মাতাও যদি না থাকেন তাহলে তাদের সমুদয় সম্পদ তাদের দুই ছেলে অর্থাৎ আপনার দুই মামা পেয়ে যাবেন ।

প্রশ্ন-৭ ঃ কোন ব্যক্তি তার সুদের টাকা দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কি?

আলাউদ্দিন, মৌলভী বাজার, সিলেট

উত্তর ঃ সুদের টাকা দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করলে তার সুদ খাওয়া ও সুদ ভোগ করাই হলো। সে সুদের টাকা নিজের কোন কাজেই ব্যবহার করতে পারবেন না। এমনকি সাওয়াবের নিয়তে দানও করতে পারবেন না। বরং সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া বিপদগ্রস্ত যেমন বন্যা দুর্গত এবং দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় ও জীবন মরণ সমস্যায় জর্জরিত লোকদেরকে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া দেয়া যেতে পারে, অথবা পেশাবখানা ও পায়খানা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তাও সাওয়াবের নিয়ত ছাড়াই হতে হবে। এর উদাহরণ হবে, মাথায় একটা দুর্গন্ধযুক্ত ময়লার বোঝার ন্যায়। এটাকে ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করে এ থেকে নিস্কৃতি লাভ করা।

প্রশ্ন-৮ ঃ কোনো সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে গেলে সে সালাতের কাযা আদায় করতে হয়। জানার বিষয় হলো- কাযা কি শুধু ফরয সালাত আদায় করতে হবে নাকি ওয়াজিব সালাত ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহরও কাযা করতে হবে?

আবুল হাসনাত, খুলনা

উত্তর ঃ ওয়াক্ত চলে গেলেও ফরয ও ওয়াজিব সালাতের কাযা (আদায়) করতে হবে। সুন্নাতের কাযা করতে হয় না। তবে ফজরের ফরযের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই ফজরের সালাত ফাউত (কাযা) হয়ে গেলে ঐ দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে তার কাযা আদায় করলে সুন্নাতসহ আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৯ ঃ আমাদের এলাকায় এবং আমাদের মাসজিদে আযান শুরু করার আগে দরূদ পাঠ করার এক নতুন ও অভিনব নিয়ম চালু হয়েছে যা আমরা এর আগে কখনো এভাবে শুনিনি। তারা আযান দেয়ার আগে, 'আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ, আস সালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ' এ দরূদ পাঠ করেই অবিলম্বে আল্লাহু আকবার বলে আযান শুরু করে। এতে মনে হয় এই দুরূদ আযানেরই অংশ। আমাদের এলাকার লোকদের জানার বিষয় হল- কুরআন ও হাদিসে এবং ইসলামী শরী'আতে এভাবে আযান দেয়ার কোন বিধান বা কোন প্রমাণ আছে কি?

আমিনুল ইসলাম, গাজীপুর

উত্তর ঃ ইসলামী শরী'আতে দরুদ পাঠ করার কথা বলা হয়েছে আযানের পর, আযানের পূর্বে নয়। মুয়াযযিন যখন আযান দেবেন তখন শ্রোতাগণ আযানের জবাব দেবেন। আযান শেষ হওয়ার পর দরুদ পাঠ করবেন। দরুদ পাঠ করার পর আযানের দু'আ (নিম্নের দু'আটি) পাঠ করবেন। হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে-

'হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু! আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে আপনার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছান। তাঁর জন্য কেয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে।'[১৮]

সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে বলবে-

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا و بمحمد رسولا و بالإسلام دينا غفور له ذنبه

হাদিসে দরুদ, কালেমায়ে শাহাদাত ও আযানের দোয়া পাঠ করার কথা বলা হয়েছে আজানের পরে, আযানের আগে নয়। অতএব আযানের আগে দরুদ পড়ার কথা সেটি আওয়াজ করে হোক বা নিঃশব্দে হোক এমন কোন কথা হাদিসে পাওয়া যায় না বা হাদিসে নেই। অতএব এটা হাদিস পরিপন্থী, না জায়েয, বিদআত ও ভিত্তিহীন কথা। ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

---

১৮. জামি আত তিরমিজি, অধ্যায় : সালাত; অনুচ্ছেদ-৪৫, পূর্ব অনুচ্ছেদের পরিপূরক, হাদিস নং-২০২